ডিসেম্বর ২০২১
জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৩

| | |
|---|---|
| গল্প | সীরাহ |
| প্রবন্ধ | কবিতা |

عنبر
Anbar

দস্তরখান

নিত্যদিনের প্রয়োজনে

ORDER NOW

/anbarbd/

DELIVERY

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ষোলো ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব © ষোলো

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: ষোলো
সম্পাদনা: লস্টমডেস্টি
প্রকাশনায়: সন্দীপন প্রকাশন

ষোলো ফেসবুক পেইজ
facebook.com/SholoOfficial

লস্টমডেস্টি
www.lostmodesty.com
facebook.com/lostmodesty

মুক্ত বাতাসের খোঁজে ফেসবুক গ্রুপ
facebook.com/groups/lostmodesty.volunteers

প্রাপ্তিস্থান:

সন্দীপন প্রকাশন
৩৪, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৪০৬ ৩০০ ১০০

অনলাইন পরিবেশক:
ওয়াফি লাইফ, রকমারি

**মূল্য ঃ ৭০ টাকা**

# অন্দরমহল


০৩ শুরুর কথা
০৪ শুভেচ্ছা বার্তাগুলো
০৬ টুকলিবাজি
১৪ বদলে যাবার দিনে
২৪ অতঃপর, হাসনাহেনা হেসেছিল
২৯ ফড়িং
৩০ চলো গল্প শুনি
৩৩ শেষ ঠিকানা
একটা লাশ ৩৬
বিন্দু থেকে সিন্ধু ৩৭
কুয়াশার চাদরে ৪০
জুমুআবার, দ্যা গ্রেইট ডে ৪৫
ডাক্তারখানাঃ ব্রণ বনাম বয়ঃসন্ধি ৪৮
হে মুসআব! আপনাকে আমার খুব ঈর্ষা হয় ৫২
বন্ধুদের ‘হাস্যকর নাম’ বানিয়ে মজা করো ৫৫
আমার পরীক্ষা ৫৭
রবের উপহার ৬০

শুরুর কথা...

বয়ঃসন্ধিকাল।

অদ্ভুত এই বয়স! অনেকগুলো ফ্যাক্টরের সাথে বোঝাপড়া করতে হয় একটা ছেলেকে এই সময়। বড়রা তেমন কাছে টানে না, একটু দূরে সরিয়ে রাখে। শরীরে পরিবর্তন আসে, পরিবর্তন আসে হৃদয়েও। এমন অনেক অনুভূতির ঝাঁপি খুলে যায় যা আগে বন্ধ ছিল। পৃথিবীটা দুর্নিবার আকর্ষণে বাহিরে টানে। আবার অজানা এক ভয়, শঙ্কাও কাজ করে। অসংখ্য এবং বিপরীতমূখী অনুভূতিগুলোর মাঝে পড়ে ছেলে-মেয়েরা এই সময় দিশেহারা হয়ে যায়। ভুল করে। এই বয়সটাই তো ভুল করার।

নিজের এবং বিপরীত লিঙ্গের শরীর, বাহিরের পৃথিবী নিয়ে অসীম কৌতূহলী মনে একঝাঁক প্রশ্ন ঘুরাফেরা করে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন না বড়রা, যাদের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। বয়ঃসন্ধিকালের জটিলতা নিয়ে কিশোররা যতটা নাজেহাল হয়, কিশোরীরা তেমন হয় না। মা, বড়বোন বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয়দের ঠিকই পাশে পায় তারা। কিন্তু কিশোরদের পাশে তেমন কেউ এসে দাঁড়ায় না। কিশোর-মন তখন উত্তর খুঁজে বেড়ায় ইচড়ে পাকা বন্ধুদের কাছে, ইন্টারনেটে। অধঃপতনের ব্যাকরণ লেখা শুরু হয় ঠিক তখন থেকেই। শুধু সেই কিশোর বালকের না, অধঃপতনের ব্যাকরণ লেখা শুরু হয় একটা সমাজ, একটা দেশেরও।

বলা হয়ে থাকে, ১২-১৩ বছরের ছেলেদের মতো এমন বালাই আর নেই। এরা হলো প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো। অনেকাংশেই সত্য। এই অবহেলা, উপেক্ষা, অনাদারে ঘরের এককোণে নিজের শরীর, সমাজ আর পৃথিবীটাকে নিয়ে সঙ্কোচ, দ্বিধায় ভোগা, হাজারো ভুল করা কিশোর-কিশোরীদের কাঁধে ভাই/বোন হয়ে হাত রাখতে এগিয়ে এসেছেন কিছু মহৎপ্রাণ মানুষ। 'মুক্ত বাতাসের খোঁজে' ফেইসবুক গ্রুপের মাধ্যমে তাঁরা বেশ কয়েকবছর ধরেই বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেবার চেষ্টা করছেন। উপেক্ষার শিকার বাংলাভাষী এই কিশোর-কিশোরীদের জন্য তাঁদেরই একটি প্রচেষ্টা এই 'ষোলো' ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটি থেকে ইনশাআল্লাহ বাংলাভাষী 'ষোলো'রা অনেক উপকৃত হবে। তারা জীবনের ভুলগুলো চিনতে এবং সেগুলো শুধরে নেবার অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহস পাবে।

ম্যাগাজিনটির ইতোমধ্যে অনলাইনে বেশ কয়েকটি সংখ্যা বের হয়েছে এবং পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছে। ষোলোদের ব্যাপক আবদারের মুখেই ষোলো ম্যাগাজিন অনলাইন কপি থেকে মলাটবদ্ধ হয়ে আপনাদের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ম্যাগাজিনের সাথে অনেক মানুষের শ্রম, ভালোবাসা, আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। একে একে তাঁদের সবার নাম নিতে গেলে আর একটি বই বের করতে হবে। ষোলোর পক্ষ থেকে সবার প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ম্যাগাজিনটি মলাটবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সন্দীপন প্রকাশন-এর আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ম্যাগাজিন, ম্যাগাজিনের লেখক-পাঠক এবং ম্যাগাজিন সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করে নিন। আমীন।

লস্ট মডেস্টি
২১ নভেম্বর ২০২১

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, পপুলার কালচার এবং মিডিয়ার মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা ও আদর্শ এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কাজ চলছে। তবে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে হবার কারণে ব্যাপারটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এ এমন এক আদর্শ যা মানুষকে সব নৈতিকতার কেন্দ্র বানায়। মানুষের খেয়াল-খুশি কিংবা ভালো লাগাকে বানায় চূড়ান্ত মাপকাঠি। যে আদর্শ শেখায় 'বাধ ভাঙ্গা' আর 'সীমানা পেরিয়ে' যাবার মাঝেই আছে প্রকৃত আনন্দ ও মুক্তি। যা অন্ধকারকে আলো আর আলোকে অন্ধকার হিসেবে উপস্থাপন করে। এই আদর্শ আমাদের না। এর জন্ম, বিকাশ ও প্রচার হয়েছে পশ্চিমে। আমাদের বিশ্বাস, পরিচয় এবং নৈতিকতার সাথে এই আদর্শ সাংঘর্ষিক। কিন্তু তবুও নানাভাবে এই আদর্শে দীক্ষিত করা হচ্ছে সমাজকে। আর এর মূল নিশানা বানানো হয়েছে কিশোর-কিশোরীদের।

ফলাফল আমাদের চোখে সামনে। পত্রপত্রিকার পাতা থেকে শুরু করে, সোশ্যাল মিডিয়া, সমাজ, পরিবার এমনকি পথেঘাটে। অবক্ষয়, অবনতি, অস্থিরতা, ক্রোধ, অশান্তি। প্রকাশ্য এ চিহ্নগুলো ছাড়াও এ অসুখ ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে সমাজকে। প্রত্যেক প্রজন্মের সন্তানেরা তাদের বাবা-মা, ঐতিহ্য থেকে আগের প্রজন্মের চেয়ে আরও বেশি হারে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রত্যেক প্রজন্মের মনে হচ্ছে, তারা একা, তাদের কেউ বোঝে না। তারা অবিচারের স্বীকার। বাড়ছে জনক ও জাতকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রসারিত হচ্ছে দূরত্ব। বড় হচ্ছে ফাটল। ভেঙ্গে পড়ছে পরিবার ও সমাজের বাঁধন।

এই রাস্তার শেষ কোথায়, আমরা জানি। এখানে বড় কোনো রহস্য নেই। আজকের পশ্চিমের সমাজ, পরিবার এবং নৈতিকতার দিকে তাকালেই এই যাত্রার পরের স্টেশনগুলোকে চেনা যায়। তবুও গভীরভাবে ব্যাধিগ্রস্থ এ আদর্শকে সুন্দর মোড়কে মুড়িয়ে আমাদের সমাজে প্রচার করা হচ্ছে। নানাভাবে তা ঢুকে পড়ছে আমাদের ঘরে। শেকড় গাড়ছে আমাদের কিশোর ও তরুণদের মন ও মগজে। এর পেছনে কাজ করছে অর্থ, ক্ষমতা ও প্রভাবের বিশাল মেশিনারি। এই আগ্রাসন থামানো আপাতভাবে কঠিন মনে হয়। কিন্তু মিথ্যা যত বড়, যত অপ্রতিরোধ্যই মনে হোক না কেন; বরাবরই দুর্বল। মাকড়সার জালের মতো। সূক্ষ্ম, তারিফ করার মতো জটিল, কিন্তু ভঙ্গুর। এই জাল ভাঙ্গার আয়োজন নিয়ে ষোলো কাজ শুরু করেছে। ষোলো'র জন্য শুভেচ্ছা রইল।

আসিফ আদনান
লেখক ও গবেষক

কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাজারে প্রচলিত ম্যাগাজিনগুলো হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখুন। এই ম্যাগাজিনগুলো কিশোর-কিশোরীদের মনোবিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখার দাবি করে। কিন্তু আপনি অবাক বিস্ময়ে দেখবেন, এরা দিনশেষে আমাদের আদরের ছোট ভাই-বোনদের, আমাদের সন্তানদের পাশ্চাত্যের অধঃপতিত জীবনধারার দিকে ডাকছে। আপনি দেখবেন, এরা মেয়েদের শেখাচ্ছে, কীভাবে লজ্জা ভেঙ্গে ছেলে বন্ধুদের সাথে পিরিয়ড নিয়ে কথা বলতে হয়, ছেলে বন্ধুদের সাথে হ্যাং-আউট করতে হয়, ট্যুর দিতে হয়। আমার আপনার ছোট ভাই-বোনদের এরা প্রেমের সবক দিচ্ছে, গর্ভপাতের পথ চেনাচ্ছে। বিজ্ঞান শেখানোর নামে ধর্ম-বিদ্বেষ, ক্যারিয়ার গাইডেন্স দেবার নামে সেকুলারিসমের দীক্ষা দিচ্ছে।

নাটক, সিনেমা, সিরিয়াল, সাহিত্য, নিউজ মিডিয়া, ম্যাগাজিন ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রমাগত মগজধোলাই এর শিকার হচ্ছে আমাদের ছোট ভাই-বোনেরা। আমাদের অজান্তেই সে পরিণত হচ্ছে অন্য এক মানুষে—যে আধুনিকতা মানে বোঝে পাশ্চাত্যের মতো উদ্দাম জীবনে গা ভাসানো, বিজ্ঞান চর্চা মানে বোঝে ইসলামকে আক্রমণ করা, সংস্কৃতি চর্চা মানে বোঝে অশ্লীলতা। আমরা বুঝি না, বুঝতে চাই না বা বুঝলেও হয়তো পাত্তা দিই না। দিহান-আনুশকার মতো কোনো ঘটনা ঘটলে তখন হুশ ফেরে আমাদের। কিন্তু তখন আফসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না আমাদের।

২০১৩ পরবর্তী বাস্তবতায় বাংলাদেশে সুস্থ ধারার বইয়ের বিপ্লব ঘটেছে। ২০১৭ পরবর্তী সময় থেকে বই বসন্ত চলছে। বহুবছর ধরে কালচাড়াল এলিটেরা সাহিত্যের জগতে যে মিথ্যাচার, অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতার প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল, তা তাসের ঘরের মতোই ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক কিশোর-কিশোরীদের জন্য ইসলামপন্থীদের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। তাদেরকে কেন্দ্র করে তেমন কোনো কাজ হয়নি। লস্ট মডেস্টি টিম বা আরও কিছু অলাভজনক সংস্থা এবং ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগে কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এমন পরিস্থিতিতে ষোলো ম্যাগাজিনের প্রকাশ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। ইনশাআল্লাহ, ষোলো ম্যাগাজিন বাংলাদেশের লাখ লাখ কিশোর-কিশোরীদের মনোবিকাশে কল্যাণকামী বন্ধু হয়েই পাশে থাকবে। অপসংস্কৃতির ফেরিওয়ালা, কালচাড়াল এলিটদের নোংরা খপ্পর থেকে বের করে নিয়ে এসে সুস্থ জীবনের পথে, প্রকৃত সফলতার পথে পরিচালিত করবে।

ষোলো ম্যাগাজিন সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ কবুল করে নিন। আমি ষোলো ম্যাগাজিনের বহুল প্রচার ও উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

ইতি
মুহাম্মাদ এনামুল হোসাইন
লেখক, সোশ্যাল এক্টিভিস্ট।

# টুকলিবাজি


লস্ট মডেস্টি

অলাভজনক সংগঠন
প্রকাশিত বইঃ মুক্ত বাতাসের খোঁজে

গভীর মনোযোগের সাথে বন্ধুকে MCQ এর উত্তর বলে দিচ্ছিলাম। কখন যে স্যার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বুঝতেই পারিনি। মাথায় একটা গাট্টা খেলাম হটাৎ। ভাবলাম পেছনের বন্ধু মনে হয় MCQ এর উত্তর জানার জন্য আমাকে ডাকছে। বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পেছনের বেঞ্চে একটু হেলান দিয়ে ফিসফিস করে বললাম- কোনটা পারিস না জলদি ক। উত্তরে গালে একটা চড় খেলাম। এবার ভয় পেয়ে গেলাম। দোস্ত আর যাই করুক চড় মারবে না তো। তাহলে? নিশ্চয়ই স্যার!

ঘাড় ঘুরে তাকাতেই দেখলাম মোটা ফ্রেমের চশমা পরা সুদর্শন এক স্যার আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। খাসা ভিলেনি হাসি।

খুব জনসেবা হচ্ছে, না? এই বলে স্যার আমার খাতা নিয়ে নিলেন। ssc পরীক্ষা। এইসময় খাতা নিলে যতটা ভয় পাবার কথা ততটা পেলাম না। কারণ আমার সব দাগানো হয়ে গেছে। আর এভাবে খাতা হারানো আমার কাছে ডালভাত।

আসলে জানেন কী, আমার মনটা খুব নরম। কেউ কোনো বিপদে পড়লে, সাহায্য চাইলে আমি না করতে পারি না। আমার বন্ধু, আমার ক্লাসমেইট... একইসাথে ক্লাস করি, খাই-দাই-ঘুরি, পাড়ার বিভিন্ন আম গাছে পিকেটিং করি, গার্লস স্কুলের সামনে রোমিও হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি (আল্লাহ মাফ করুন) আর তারা পরীক্ষার হলে সাদা খাতা জমা দিবে, কলম কামড়াতে কামড়াতে প্রায় খেয়ে ফেলবে এ দৃশ্য আমি কোনোমতেই সহ্য করতে পারি না। আমার বুক ভেঙ্গে যায়। চোখে পানি চলে আসে। তাই সবাইকে সমানে সাহায্য করি।

কোচিং আমার খুব একটা ভালো লাগতো না। তারপরেও যেতে হতো। কোচিং এর পরীক্ষাগুলাতে তেমন গার্ড থাকতো না। মন শান্তি করে দেখাদেখি করতাম। জনসেবা করতাম। বন্ধুরা খুশি হয়ে সিংগাড়া, সমুচা খাওয়াত। মালদার বন্ধুরা পেস্ট্রি কেক, বার্গার, স্যান্ডউইচ ইত্যাদি ফরেন জিনিস খাওয়াত। আমি অবশ্য খেতে চাইতাম না। না খেলে আবার তারা কষ্ট পাবে! তাদের কষ্ট আমি কীভাবে সহ্য করব! আগেই বলেছি আমার মন খুব নরম। তাই যে যাই দিত তাই খেতাম। সর্বভূক।

ভার্সিটিতে উঠার পর জনসেবার পরিসর বাড়ল। পরীক্ষায় দেখানোর পাশাপাশি যুক্ত করলাম নতুন সেবা- প্রক্সি দেওয়া। রুমমেটদের সবার দিন শুরু হতো রাত ১২ টার পরে। মুভি, সিরিয়াল, ২৯, ভিডিও গেইমস, জানপাখির সাথে ফোনে কুটুর কুটুর...। এতো ব্যস্ততা আর দায়িত্ব পালন করে এরা ঘুমাতে যেত ফজরের আযান শুনে।

দয়ামায়াহীন স্যারগুলো আবার ক্লাস দিয়ে রাখত সকাল ৮ টায়। স্যারেরা এত নিষ্ঠুর। এই অসহায় ছেলেগুলোকে ৮ টায় ক্লাসে আসতে বলা যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। আহা! ছেলেগুলোকে কি ঘুমানোর সময়ও দিবে না! ওদের দুঃখে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। আবেগী গলায় কাব্যিক ঢং এ বললাম- তোরা এটেন্ডেন্স নিয়ে চিন্তা করিস না... এই আমি বেঁচে থাকতে তোদের কোনো ভয় নেই।
গণহারে প্রক্সি দিতাম। এক ক্লাসে ৪/৫ টাও।

আইডি ২০
- জ্বি স্যার (স্বর মোটা করে)

আইডি ৪০
- ইয়েস স্যার (স্বর চিকন করে)

আইডি ৫৬

- প্রেজেন্ট স্যার (বুক ফুলিয়ে। কারণ এটাই আমার আইডি।)

আইডি ৭৬
- উপস্থিত স্যার। (খাতার মধ্যে মাথা লুকিয়ে বা বেঞ্চের নিচ থেকে কলম তুলতে তুলতে)

## এত জনসেবা করি ভেবেই বোধহয় আল্লাহ একের পর এক রিযক পাঠাতে থাকলেন!

বন্ধুদের টাকায় ক্যান্টিনের চা, সিংগাড়া, পরোটা-ডিম ভাজি, ডিউয়ের কাচের বোতল খেয়ে খেয়ে আমার ভুড়ি হয়ে গেল!
এভাবেই চলছিল আমার জনসেবা। হটাৎ দুইটা ঘটনা ঘটল। পরপর।

১। আমাদের একটা সেমিস্টারে ভাইভা ছিল এক কোর্সের। ফাইনালের আগের সপ্তাহে। সেই স্যারের ভাইভার নিয়ম ছিল ক্লাস নোট নিয়ে ভাইভা দিতে যেতে হবে।

আমি সুন্দর করে নোট করে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার খাতাটা একজন টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে যায়। আমি রুমে ছিলাম না সে সময়। পরে আর ফেরত দেয়নি। আমিও খুঁজে পাইনি।
তো, ভাইভা কীভাবে দিব সেই চিন্তা করছিলাম। এমন সময় পাশের রুমের বন্ধু বলল- দোস্ত, চিন্তা করিস না, তুই আমার খাতা নিয়ে যাস।

তার ভাইভা ছিল সকালে। আমারটা কিছু পরে। সে ভাইভা দিয়ে আসলো। আমি গেলাম ওর খাতা নিয়ে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম কোথাও ওর নাম লেখা আছে কিনা। নেই। তারপরেও বাড়তি সতর্কতা হিসেবে তার খাতার কাভার খুলে ফেললাম।

স্যার খাতা উলটাচ্ছেন আর ভাইভা নিচ্ছেন। মোটামুটি পারছি। স্যার আমাকে এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করলেন- এটা কি তোমার খাতা? সিউর?
আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রতিবারই বললাম- ইয়েস স্যার।

হটাৎ এক পেইজে যাবার পর স্যার হুংকার দিয়ে বললেন- এটা কী? এটা তো আমার সিগনেচার। (স্যার একটা জায়গায় খুব ছোট করে সিগনেচার দিয়ে রেখেছিলেন)

তুমি কেন আমাকে মিথ্যা বললে? কেন বললে এটা তোমার খাতা? তোমার মুখে তো দাঁড়ি দেখছি!

আমার লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গেল। একটা কথাও বলতে পারলাম না। স্যারকে যে সরি বলব এটাও মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল না। পরের কয়েকটা দিন শুধু মাথার মধ্যে ঘুরছিল,

## ‘তোমার মুখে তো দাঁড়ি দেখছি, তোমার মুখে তো দাঁড়ি দেখছি’!

এর ৭ দিন পর ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলো। শেষ পরীক্ষার দিন ঘটল আরেকটা ঘটনা। আমি একটা প্রশ্ন পারছিলাম না। একটা জায়গায় আটকে ছিলাম। পরীক্ষা হচ্ছিল বিশাল হলরুমে। হটাৎ কারেন্ট চলে যাওয়াতে রুম অন্ধকার হয়ে গেল। আমি সুযোগটা কাজে লাগালাম। কিছুদূরেই আমার এক বন্ধু বসে ছিল। ডাক দিলাম ওর নাম ধরে... ওর ঠিক পেছনেই স্যার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবছা অন্ধকারে ঠিক খেয়াল করতে পারিনি। স্যার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর ওর খাতা নিয়ে গেল। ১০ মিনিট পর ফেরত দিল।

আমি এই ১০ মিনিটের মধ্যে ঐ সমস্যাটার সমাধান করে ফেলেছিলাম প্রশ্নপত্রের অপর পৃষ্ঠায়। আমি সব এন্সার দিয়ে আসলাম। কিন্তু আমার বন্ধু সব শেষ করতে পারল না। ওর মুখটা কালো হয়ে গেল দুঃখে। আমি এই ঘটনায়ও বেশ নাড়া খেলাম।

বিকালে এক এক করে বাড়ি যাচ্ছিল সবাই হল ছেড়ে। মন খারাপ নিয়ে মাঠের এক কোণায় বকুল গাছের নিচে বসে ছিলাম আমি। নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। ঐ বন্ধুর মন খারাপ করা মুখ আর স্যারের বলা সেই কথাগুলা মাথায় ঘুরছিল- তুমি কেন আমাকে মিথ্যা বললে? কেন বললে এটা তোমার খাতা? তোমার মুখে তো দাঁড়ি দেখছি...!

টিকেট কাটা ছিল বাসের। সময়ও হয়ে আসছে। কিন্তু এতই মন খারাপ হয়ে ছিল, কিছু করতে ইচ্ছা করছে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এভাবে কতক্ষণ গেল খেয়াল নেই। ঘাড়ে একটা মৃদু স্পর্শ পেলাম। দেখি মাহমুদ দাঁড়িয়ে আছে আমার পেছনে। কাঁধে ব্যাগ। বাসায় যাচ্ছে। আমার পাশের রুমেই থাকে।

কী রে, বাসায় যাবি না?- জিজ্ঞাসা করল ও।
- কী জানি! হাসি দিয়ে বললাম আমি। আমার সেই হাসিতে হতাশা, দুঃখ সব মিশে ছিল।
- কী হয়েছে? মন খারাপ কেন?
- কিছু না, মন খারাপ কই দেখলি!
- আরে, বল না!

মাহমুদকে বললাম। ভাইভার কথা আর আজকে পরীক্ষার হলের কথাও। সে সব শুনে বলল- দেখ, আল্লাহ মনে হয় তোকে এই পাপ কাজটা থেকে ফেরাতে চাচ্ছেন, তাই হয়তো এমনটা করেছেন। দেখ, চিন্তা কর তুই। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবি- এই যে প্রক্সি দেওয়া, পরীক্ষায় দেখাদেখি করা সেটা পাপ। সেটা প্রতারণা। আল্লাহ চাচ্ছেন না তুই এগুলো করিস। থাক যাইরে... ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে। প্যান্টের ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে সে উঠে গেল। কিছুদূর যাবার পর আমার দিকে ফিরে হাসিমুখে চিৎকার করে বলল- মন খারাপ করিস না। বাড়িতে যা। ছুটি কিন্তু বেশি দিনের না!

আমিও উঠে পড়লাম। রুমে ফিরে আসলাম। ব্যাগ গুছিয়ে ঝড়ের বেগে বাস ধরার জন্য বের হলাম।

বাসে উঠার পর মাহমুদের কথাগুলো ভাবছিলাম। আসলেই কি প্রক্সি দেওয়া, পরীক্ষায় অন্যদের সাহায্য করা পাপ? চলন্ত বাসে খুব একটা ভালো নেট পাবার সম্ভাবনা নেই। তারপরেও সার্চ দিলাম। কিছু লিংক আসলো। সেগুলোতে অনেক কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স দেওয়া। সব পড়ে বুঝলাম যে, হ্যাঁ, মাহমুদের কথাই ঠিক। এগুলো পাপ। প্রতারণা। আমি না বুঝে অনেক পাপ করেছি। শয়তান আমাকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। পরে একজন আলিমকে জিজ্ঞাসা করলাম। উনিও এমনটাই বললেন। তোমাদের জন্য পুরো বিষয়টি একটু সহজ করে বলি।

ধরো, আমি যখন প্রক্সি দিচ্ছি তখন আসলে হচ্ছে টা কী?
১। আমি মিথ্যা কথা বলছি। আমার আইডি ৩০ না, কিন্তু স্যারকে বলছি যে, আমার আইডি ৩০।
২। আমি প্রতারণা করছি। স্যারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি।
৩। আমি প্রক্সি দিচ্ছি বলেই আমার বন্ধুরা এটেন্ডেন্সের নম্বর পাচ্ছে। এটা তাদের জন্য হালাল হচ্ছে না। কারণ, তারা তো আসলে ক্লাসে আসেনি।

৪। আমি প্রক্সি দিচ্ছি। এর ফলে বন্ধুরা এটেন্ডেন্সের নম্বর হারানোর ভয় করছে না। তারা এই সুযোগে রাত জেগে বিভিন্ন পাপের কাজে লিপ্ত হচ্ছে। তারা পাপ করছে। পাপের সাময়িক মজা পাচ্ছে। কিন্তু আমি সেই সাময়িক মজাটুকুও পাচ্ছি না। কিন্তু আমাকে তাদের পাপের ভাগীদার হওয়া লাগছে। আল্লাহর কথার অবাধ্য হচ্ছি।

*'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা কোরো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।'* [১]

**সামান্য ৫ মার্ক ছাড়তে পারি না, ৫ লাখ টাকা ছেড়ে দেব- এমন আত্মবিশ্বাসী হওয়া ভালো না।**

পরীক্ষায় দেখাদেখি করে লেখার সময় আমি কী কী করছি–

১। আমি প্রতারণা করছি। আমি যে প্রশ্নের উত্তর জানি না সেই প্রশ্নের উত্তর লিখছি। এতে স্যার ভাবছেন, আমি সেই প্রশ্নের উত্তর জানি। স্যারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

২। আমি বন্ধুদের দেখাচ্ছি। সে ভালো রেসাল্ট করছে। ভালো নম্বর পাচ্ছে। কিন্তু সে তো ভালো রেসাল্টের যোগ্য ছিল না। প্রতারণার মাধ্যমে এমন করল।

৩। আমি বন্ধুদের পরীক্ষার খাতায় দেখাব, তারা ভালো নম্বর পাবে... এই আশায় তারা পড়াশোনায় অবহেলা করে। এর ফলে ভালো রেসাল্ট নিয়ে বের হলেও তেমন যোগ্যতা অর্জন হয় না। কর্মক্ষেত্রে গেলে সে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুক্ষীণ হবে। জাতি তার সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে।

আর এই প্রক্সি দেওয়া, পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করা- এগুলো আমি বন্ধুদের উপকার করার মানসিকতা থেকে করলেও দিনশেষে আমার বন্ধুদের ক্ষতিই করছি।

এখন এই মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, অসততা, অন্যের ক্ষতি করা এগুলোর ব্যাপারে কুরআন, হাদীসের কী বক্তব্য?

*'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।'*[২]
মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন,

*'মিথ্যা থেকে দূরে থাকো। কারণ, মিথ্যা উপনীত করে পাপাচারে। আর পাপাচার উপনীত করে জাহান্নামে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে ও মিথ্যার অন্বেষায় থাকে, এভাবে একসময় আল্লাহর কাছে সে চরম মিথ্যুক হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।'*[৩]

প্রতারণার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, *'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়; আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।'* (মুসলিম)

হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, যেকোনো কাজে-কর্মে প্রতারণা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্ত হাদীসের আওতাভুক্ত। পরীক্ষায় প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার বিষয়টিও সেগুলোর মধ্যে একটি।

[১] সূরা মায়িদা, ৫ : ২

[২] সূরা মুমিন, ৪০ : ২৮
[৩] মুসলিম, ২৬০৭

পরীক্ষায় নকলের ব্যাপারে শাইখ বিন বায রহ. এর ফাতাওয়া:

তিনি বলেন, 'পরীক্ষায় নকল করা মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতারণার মতোই হারাম ও ন্যাক্কারজনক কাজ। বরং সাধারণ লেনদেনের চেয়ে পরীক্ষায় নকল করা বেশি ভয়ানক হতে পারে। কারণ, নকলের মাধ্যমে সে হয়তো বড় বড় চাকুরি লাভ করবে। সুতরাং, পড়াশোনার সকল ক্ষেত্রে নকলের আশ্রয় নেওয়া হারাম। কারণ, সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

*"যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"*

তাছাড়া এটি একটি খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"হে ঈমানদারগণ, তোমরা জেনে-শুনে খিয়ানত কোরো না আল্লাহ ও রাসূলের সাথে এবং খিয়ানত কোরো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতের ক্ষেত্রে।"*[৪]

সুতরাং শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন কোনো পাঠ্যবিষয়েই নকলের আশ্রয় না নেয়। বরং তারা যেন প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে। যেন তারা বৈধভাবে উত্তীর্ণ হয়।'

[৪] সূরা আনফাল, ৮ : ২৭।

অন্যান্য শাইখদের এমন ফাতাওয়া-
https://tinyurl.com/szmjkrk৫
https://tinyurl.com/btysra৭a
https://tinyurl.com/৮৩৬m৭pfw

ভাই দেখো, আমরা দেখাদেখি করে ভালো রেসাল্ট করলেই যে ভালো জব পাব, এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। বরং এভাবে দেখাদেখি করার কারণে, নকল করার কারণে আল্লাহ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদের রিযক থেকে বরকত তুলে নিতে পারেন।

*'আর যদি জনপদগুলোর অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতগুলো তাদের ওপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত, তার কারণে আমি তাদের পাকড়াও করলাম।'*[৫]

দেখো ভাই, হারাম কখনো ভালো ফলাফল বয়ে আনে না। হারাম হারামই। তুমি ধরো হারাম কাজ করে ভালো চাকরি পেলে, অনেক টাকা কামায় করলে, কিন্তু দেখবে তোমার অন্তরে শান্তি নেই। রাতে ঘুম আসে না। ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয়। ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি করতে হয়। অথবা দেখবে তোমার ছেলে ফেন্সি খায়, বাবা খায়, তার বন্ধু-বান্ধব সব হিরোইঞ্চি। অথবা দেখবে তোমার মেয়ে খুব খারাপ কাজ করে বেড়াচ্ছে, তোমার বউ পরকীয়া করছে। হারামের শাস্তি এই দুনিয়াতেই পাবে। এবং আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি তো তোলায় থাকল।

দেখো ভাই, ছোট ছোট ব্যাপারগুলোতে

[৫] সূরা আরাফ, ৭ : ৯৬

আল্লাহর হুকুম মানার মাধ্যমেই আসলে আমরা কঠিন পরীক্ষায় উতরে যাবার তরবিয়ত পাই। এখন আমরা ৫ মার্কের লোভ সামলাতে পারছিনা। নকল করছি, দেখাদেখি করছি, প্রক্সি দিচ্ছি। কর্মজীবনে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, ৫ লাখ টাকার ঘুষের অফার চলে এসেছে। তখন কীভাবে লোভ সামলাব?
সামান্য ৫ মার্ক ছাড়তে পারি না, ৫ লাখ টাকা ছেড়ে দেব- এমন আত্মবিশ্বাসী হওয়া ভালো না। আসো, আল্লাহর জন্য এই ছোট ছোট ব্যাপারগুলোতেও মনোযোগ দিই। কুরবানি দিই। ইনশাআল্লাহ, ঈমানের কঠিন পরীক্ষা আসলে আমরা সেই পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়ে পাশ করব।

দুইটা ছেলের গল্প বলে এই দীর্ঘ লেখাটা শেষ করছি।

আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে ছিল। সেই ছেলেও একসময় দেখাদেখি করে লেখত শুনেছিলাম। কিন্তু পরে যখন জানল যে, দেখাদেখি করা উচিত নয়, প্রতারণা তখন বাদ দেয়। এরপর আর দেখাদেখি করেনি। এমনকি অনেক সময় সাদা খাতা জমা দিয়েছে। সুযোগ থাকার পরেও দেখেনি। এই ছেলে মাঝারি মানের একটা রেসাল্ট নিয়ে বের হয়। আমি ছিলাম তার পাশের রুমেই। আমাদের সবার আগে এবং অনেক ভালো রেসাল্ট করা ছেলেদের আগেও সে খুব ভালো একটা চাকরি পায়। পাশ করার কিছুদিনের মাঝেই। বউ বাচ্চা নিয়ে ভালোই আছে সে এখন। প্রশান্তিভরা জীবন কাটাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ।

দুই নম্বর যে ছেলের কথা বলতে চাচ্ছি, সে ছিল আমাদের স্কুলের। থার্ড বয়। আমাদের প্রি-টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছিল রমাদান মাসে। তো, আমাদের শহর জুড়ে সবগুলো কোচিং সেন্টার একটা অফার দিয়েছিল। কেউ যদি প্রি-টেস্টে সব বিষয়ে এ প্লাস পায় (গোল্ডেন এ প্লাস আরকি) তাহলে সে একদম ফ্রি এসএসসি পরীক্ষার কোচিং করতে পারবে। প্রায় ৩/৪ হাজার টাকা সেইভ। তখনকার সময় এটা অনেক টাকা ছিল। (বাবাকে অবশ্য আমি এই অফারের খবর জানতে দিইনি!)

তো, আমার সেই বন্ধুর সিট পড়েছিল আমার ঠিক পেছনেই। গণিত পরীক্ষা ছিল। তারাবীহ পড়ার কারণে সে পুরো সিলেবাস শেষ করতে পারেনি। আর প্রশ্নও ছিল সেই কঠিন। টেনেটুনে ৮০ তোলাই বিপদ। সে যা এন্সার করল তাতে ৭৭/৭৮ পাবে। আর বাকি বিষয়গুলাতে এ প্লাস শিউর। একটা উপপাদ্য নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। ১০ মার্কের। এটা করতে পারলে এ প্লাস শিউর। কিন্তু স্যার এই উপপাদ্য টা বানিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই পারেনি সেটা। আমি আবার ম্যাথে বেশ ভালো ছিলাম (জ্বি, ঠিক ধরেছ, ভাব নিলাম একটু...!)। আমি এটার সমাধান করে ইতোমধ্যেই কয়েকজনকে দেখিয়ে ফেলেছি। তাকেও দেখালাম। সে লেখল। লেখার পর হটাৎ কী হলো... আমাকে আস্তে করে বলল, না সাওম রেখে আমি এভাবে কপি করব না। এই বলে সে একটানে উত্তর কেটে দিয়ে আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে গেল। ৩/৪ হাজার টাকার লোভ সামলে নিল।

এই ছেলেটাও পরীক্ষাতে দেখাদেখি করত না। কখনো না। ক্লাসের ক্যাপ্টেন ছিল। খুব সৎ। আমার জীবনে দেখা সৎ ছেলেদের একজন। এও বেশ ভালো আছে। ভালো চাকরি করছে। ট্রেনে হটাৎ একদিন দেখা। খুব কিউট একটা পিচ্চির বাবা সে এখন।

আশেপাশের মানুষজন আর যাই করুক, যত প্রলোভনই আসুক, সৎ থাকো ভাই। সততার কোনো বিকল্প নেই। তোমার কাছে হয়তো মনে হবে, সৎ থাকলে তুমি পিছিয়ে যাবে। অসতেরা এগিয়ে যাবে। এটা একদম ভুল ধারণা ভাই। একদম।

কিন্তু যারা অসৎ হয়, তারা কখনো রেসে জেতে না। খরগোশের মতো তারা হয়তো এক লাফে অনেকদূর এগিয়ে যায়। কিন্তু দিনশেষে তাদের রেস শেষ হয় না। পাপের হতাশা, গ্লানি, অবসাদ, শাস্তি তাদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়। ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। সৎ মানুষেরা কচ্ছপের গতিতে এগুলেও একমাত্র তাঁরাই পারে রেস শেষ করতে।

খরগোশ হোয়ো না। কচ্ছপ হও।

“

**তুমি ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না**

”

**সূরা হুদ, ১১ : ১১৫**

Lone Wayfarer
বদলে যাবার দিনে

১

আমি 'এম'। বাসায় মোটামুটি ধর্মীয় পরিবেশ থাকায় ছোটবেলা থেকেই নৈতিকতার বাউন্ডারির ভেতরেই বড় হয়েছি। লাগামছাড়া উদ্দাম লাইফস্টাইল থেকে গা বাঁচিয়ে গোছানো একটা জীবন যাপন করতাম। ছাত্রজীবনের বেশিরভাগ সময় সহশিক্ষার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকায় প্রেম-টেম করার খুব বেশি সুযোগ কখনো তৈরি হয়নি। সুযোগ আসলেও এসব থেকে সযত্নে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম।
রাস্তার কোণায় অন্ধকার চিপায় দাঁড়িয়ে ফোনে ফিসফাস, কথা বলতে বলতে নির্ঘুম রাত কাটানো, টিউশনির সব টাকা রিচার্জ, গিফট আর ডেটিং এর পেছনে উড়ানো... একদম ব্যক্তিত্বহীন আচরণ মনে হতো। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই হারাম সম্পর্কে জড়িত থাকায় ওদের দেখে অনুভব করতে পারতাম, হারাম সম্পর্ক কীভাবে মানুষকে নৈতিকভাবে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়।

কারও সাথে দুই মিনিট কথা বলার পর আমার স্টকে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার মতো আর কোনো টপিক থাকে না। অথচ এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকবকিয়ে যায় অনর্গল! এত্তো এত্তো টপিক কই পায় এরা! ভাবনায় কুলোয়নি কখনোই।

রুটিনমাফিক গোছানো জীবনযাপন, সব ঠিকঠাকই ছিল। লেখাপড়ার পাশাপাশি একটা খণ্ডকালীন চাকরিতে প্রবেশ করার পর থেকেই যত বিপত্তির শুরু। অবাধ মেলামেশার জোয়ারে ভেসে গিয়ে খেই হারাতে সময় লাগেনি বেশিদিন। খুব বেশি প্র্যাকটিসিং তখন ছিলাম না। শুধু সালাতটা নিয়মিত আদায় করতাম। এতটুকুই।

এক মেয়ে কলিগের সাথে জড়িয়ে যাই অল্প কিছুদিনেই। যেঁচে এসে নানান ঢঙে কথা বলা, এটা ওটা চেয়ে নেয়া, বিভিন্ন রকমের ইঙ্গিত, ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট, ঠুনকো কারণে ইনবক্সে নক দেয়া, 'দুষ্টুমি' করে ফোন দেয়া...

আমার দীর্ঘদিনের গড়ে তোলা নৈতিকতার দেয়াল ভেঙ্গে হারাম সম্পর্কের কাঠামো তৈরি করার জন্য একদম বুলডোজারের মতো কাজ করেছে এগুলো। সরাসরি খুব বেশি কথাবার্তা-মেলামেশা না হলেও ইনবক্সে আলাপের মৃদু হাওয়া 'হাই-হ্যালো'র সাগর পেরিয়ে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত বিষয়-আশয় নিয়ে চ্যাটিং এর দিকে গিয়ে গভীর নিম্নচাপের রুপ নিয়ে আরেকটু শক্তি সঞ্চয় করে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হয়ে আঘাত হেনে সবকিছু ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে খুব বেশিদিন সময় নেয়নি। তারপর একদিন চ্যাটে প্ল্যান করে রেস্টুরেন্টে বসা, আইসক্রিম খাওয়া। গাঢ় অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু এভাবেই।

অপর পাশ থেকে প্রলুব্ধ করার নানান রঙের চেষ্টার মধ্যেও এই আকর্ষণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা কম করিনি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে শয়তানের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে আর কতক্ষণই বা সংগ্রাম করা যায়? শুভ্র পোশাকে কাদায় নাচতে নেমে আপনি কতক্ষনই বা কাপড়ের শুভ্রতা রক্ষা করতে পারবেন?

"'এম', তুমি তো এমন না! এগুলো তোমার জন্য না, তোমার সাথে যায় না এসব!", "দেখো, তুমি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, ঐ ধনীর দুলালি তোমার জন্য না। পরে কষ্ট পাবা অনেক", "আল্লাহকে ভয় করো, তুমি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত একটা ছেলে। তোমার মূল্যবোধের সাথে, তোমার ব্যক্তিত্বের সাথে এটা কোনোভাবেই যায় না, তোমার উচিত হবে না

এই ফাঁদে পা দেয়া।” নিজেই নিজের অভিভাবক হয়ে নিজেকে উপদেশ দিচ্ছিলাম অনবরত। কেন আমার এই হারাম সম্পর্কে জড়ানো উচিত না, এই টপিকে নোট লিখতাম ফোনে। সালাতের পর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতাম। হারাম সম্পর্কে না জড়ানোর পক্ষে শতটা কারণ প্রস্তুত ছিল। বিবেককে ঠিকঠাক ভাবে কাজে লাগানোর সব চেষ্টাই করেছি। অন্ধ আবেগ আমার সব চেষ্টাই গ্রাস করে নিয়েছে। কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি।

হবে কীভাবে? সারারাত নিজের সাথে সংগ্রাম করে, নিজেকে শাসন করে দিনের বেলা তো সেই ফাঁদের মায়াজালেই নিজেকে সঁপে দিচ্ছি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে ফ্রি-মিক্সিংওয়ালা পরিবেশে চাকরি করছি, দৃষ্টি হিফাযতের বালাই নেই, ফ্রেন্ডলিস্টে জায়গা দিচ্ছি, মেসেঞ্জারে চ্যাট করছি, একই সাথে হারাম সম্পর্ক থেকেও বাঁচতে চাইছি। কীভাবে সম্ভব?

হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিলাম ঠিকই, তবে এটা ছিল প্রতিনিয়ত নিজের সাথে একটা যুদ্ধ। ঘুম ভাঙলেই বুক কেঁপে উঠত। প্রচন্ড খারাপলাগা ঘিরে ধরত। দিন গড়াতে গড়াতে অবশ্য সব ঠিকঠাক।

‘কাছে আসা’র সেই চিরাচরিত নিয়মে চলছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাট, বয়ে যেত ইমোজির বন্যা-স্টিকারের নহর! গভীর রাত পর্যন্ত ফোনে ফিসফাস, ডেটিং এ যাওয়া। বদলে গিয়েছিলাম খুব। যেই আমি রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে যেতাম, সেই আমি রাত তিনটায়ও সজাগ। সন্ধ্যার পর টিউশনি সেরে রাস্তার চিপায় দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে ফোনে কথা বলাটা, পথচারিদের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টির দিকে গা না করে চালিয়ে যাচ্ছিলাম রুটিনমাফিক। টিউশনিতে ফোন ব্যবহার রীতিমতো অপরাধ গণ্য করতাম। সেই আমিই টিউশনে বসে চ্যাট করে যাচ্ছি অবলীলায়! সারাক্ষণ ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকা, ঘন ঘন বাইরে যাওয়া, ফোনের বিভিন্ন এপে লক দেয়া, জীবন-যাপনে নানান অনিয়ম।

যে আচরণগুলো চরমভাবে ঘৃণা করতাম, ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় মনে করতাম, সেই আচরণগুলোকেই আপন করে নিয়েছিলাম খুব করে। যেন এক অন্য আমি। ব্যক্তিত্ব হারানো, ঈমান হারানো, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য এক আদর্শ কুপ্রবৃত্তির গোলাম।

মান-অভিমান, খুনশুটি, ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন, এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। অবিরাম এই যিনাকে শয়তান পরবর্তী রূপ দেয়ায় সচেষ্ট হলো এবার।

মাঝে মাঝে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হতাম, এই আমিই কি সেই আমি? আয়নায় তাকালে নিজেকে চোর চোর মনে হতো। খারাপ কিছু করে ফেললে পরে প্রচন্ড অনুতাপ কাজ করত। নফল সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করতাম অনুতপ্ত হৃদয়ে। আল্লাহ রক্ষা না করলে একদম খারাপ পর্যায়ের যিনায় লিপ্ত হয়ে যেতাম নিশ্চিত। প্রতিটা হারাম সম্পর্কই একসময় চূড়ান্ত পর্যায়ের যিনার দিকে এগিয়ে যায়। অবাক হয়ে অনুধাবণ করেছিলাম, আল্লাহর অবাধ্যদের শয়তান কীভাবে কুপ্রবৃত্তির দাস বানিয়ে দেয়। আপনি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে একটু ছাড় দিলেই হবে, বাকিটা শয়তান নিজ দায়িত্বে আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেবে।

২.

শিক্ষাজীবনের শেষ পর্যায়ে তখন। এই বয়সী মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ ছেলেদের স্বাভাবিক

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়ে সব এলোমেলো হয়ে গেল। সমবয়সী ধনীর কন্যাকে বিয়ে করার যোগ্যতা অর্জনের এক বিশাল চাপ ভারী পাথর হয়ে বুকে চেপে বসেছিল। বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করলে বিভিন্ন কারণেই এটা ছিল স্রেফ একটা আকাশ-কুসুম পরিকল্পনা। মেয়ের পরিবার থেকেও বিয়ের তোড়জোড়। একা একা এই চাপ নেয়া সম্ভব হচ্ছিল না কোনোভাবেই। হারানোর ভয়ে একদম চুপসে যেতাম। ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছিলাম। রাতের ঘুম নাই হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুবান্ধব কারও সাথেই শেয়ার করিনি ব্যাপারটা। হারাম সম্পর্কের পুরো ব্যাপারটাই একদম গোপন রেখেছিলাম সবার কাছ থেকে।

বিয়ের পাত্র হিসেবে যোগ্যতর হওয়ার আশায় আগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অমানুষিক খাটুনি আর মানসিক চাপওয়ালা আরও ভালো বেতনের এক চাকরিতে ঢুকলাম। নতুন এক সংগ্রাম। ভোরে বেরিয়ে রাতে বাসায় ফিরতাম। দাঁতে দাঁত চেপে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এর মাঝে মেয়ের হঠাৎ হঠাৎ রহস্যজনক আচরণে ভেতরটা একদম ভেঙেচুরে যেত। দুই দিকের সংগ্রামে একদম চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছিলাম। গলায় ফাঁস হয়ে আটকে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে।
যাদের কোনো হারাম সম্পর্ক নেই তাদের দেখেই ঈর্ষা লাগত, আহা! কত স্বাধীন ওরা! আগের 'আমি' কে মিস করতাম খুউব।

আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে কান্না করতাম আর দুআ করতাম সবকিছু সহজ করে দেয়ার জন্য। তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যেতাম, শেষরাতে কান্না করতাম আল্লাহর কাছে। ক্রমাগত আল্লাহর কাছে অসহায় চিত্তে সিজদাবনত হতে হতে নিজের মধ্যে বিশাল একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম আল্লাহর চরম অবাধ্যতায় লিপ্ত রয়েছি এই সম্পর্কে জড়িয়ে। সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি কাজ করত। আল্লাহর অবাধ্য হতেও বাঁধছিল, আবার ঐ মেয়ের কথা ভাবলেও বুক চিনচিন করে উঠত।

বাসার দিক থেকে নানান রকম প্রেশার সামলাতে হচ্ছিল ওকে। ওদের প্রত্যাশার সাথে আমার স্ট্যাটাসের দূরত্ব তখন আলোকবর্ষ সময়। এই অবস্থায় হালালভাবে ওদের বিয়ের প্রস্তাব দেবার চিন্তা করাটাও চরম দুঃসাহসিকতা। শুধু আবেগই ছিল সম্বল, আর কিছুই ছিল না। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ফোনে কথা বলতে গেলেই বুঝতে পারতাম আল্লাহর অবাধ্য হচ্ছি। নিজের সাথে অনবরত যুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে তাকদীরের মালিক আল্লাহর কাছেই হাত পাতলাম সাহায্যের আশায়।

ইসতিখারার আমল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইশার পর বিনয় সহকারে দু'রাকাত সালাত আদায় করে হাত তুললাম। দুআর অর্থটা একদম হৃদয়ের ভেতর থেকে অনুভব করে করে মহান আল্লাহর কাছে ভিক্ষা করলাম সেই অনিন্দ্য সুন্দর দুআটি পড়ে–

'হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের সাহায্যে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

হে আল্লাহ! এই কাজটি (উদ্দিষ্ট বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করে) যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী

আমার দ্বীন, আমার জীবন, আমার ইহকাল এবং পরকালের জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করুন এবং আমার জন্য তা সহজ করে দিন। অতঃপর এতে আমার জন্য বরকত দান করুন।

আর এই কাজটি (উদ্দিষ্ট বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করে) যদি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী আমার দ্বীন, আমার জীবন, আমার ইহকাল এবং পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি তা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন’।[১]

কী সুন্দর আর প্রশান্তিদায়ক! আল্লাহু আকবার! অর্থ বুঝে মুখস্ত করলে অন্যরকম প্রশান্তিদায়ক এক দুআ। অন্যরকম একটা হালকাভাব অনুভব করতাম এই আমলটা করার পর থেকে। উথাল-পাথাল আবেগের জঞ্জাল ছাড়িয়ে বিবেককে কাজে লাগাতে পারছিলাম আগের চেয়ে অনেক সুচারুভাবে। আল্লাহর সাথে অন্যরকম একটা নৈকট্য অনুভব করছিলাম। যেকোনো দুআ করলেই চোখ ফেঁটে পানি গড়িয়ে পড়ত টপটপ। এরকম পরিবর্তন নিয়ে আবার আল্লাহর অবাধ্যতায় ফিরে যাওয়া আসলেই সম্ভব ছিল না।

আল্লাহ আমার দুআ কবুল করেছিলেন। আমার জন্য উত্তম পন্থাটাই নির্ধারণ করেছিলেন আমার রব।

৩.

আস্তে আস্তে যোগাযোগ কমিয়ে দিলাম। ফোনে কথা বা মেসেঞ্জারে যথাসম্ভব আবেগের ছোঁয়া না রেখে কথা বলতাম। ‘তুমি’ থেকে ‘আপনি’তে নেমে এসেছিলাম। খুব কষ্ট পেতো এই ব্যবহারে।

এভাবে আস্তে আস্তে যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলাম। মেয়ে হয়তোবা ভেবেছিল অভিমান করে আছি। কিছুদিন পরেই ছিল আমার জন্মদিন। উইশ করার জন্য ফোন আসলো, রিসিভ করিনি। মেসেঞ্জারে উইশ আসলো, কোনো রিপ্লাই দিইনি। এসএমএস আসলো, রেসপন্স করিনি। পুরো একটা দিন শত চেষ্টা করেও কোনোরকম সাড়া না পেয়ে একদম পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক কল, অনেক মেসেজ, ইনবক্সে অনেক লেখালেখি। আরও অনেক কিছু। কোনো সাড়াই দিইনি। সাড়া দিলে নির্ঘাত আলুথালু আবেগের ঝড়ের কাছে মার খেয়ে যেতাম। যেই আমি মেয়েটাকে হারানোর ভয়ে নির্ঘুম রাত কাটাতাম সেই আমিই আজ কত নিষ্ঠুর!

মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে, নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে, কান্না করছে এসব চিন্তা মাথায় ঢুকতেই দিইনি। নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রে চরম পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছিলাম। আমার নিষ্ঠুরতা শয়তানের সাথে, শয়তানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে কন্ট্রোল করছিলাম আর মাথায় একটা জিনিসই বারবার আনছিলাম,

‘আমি আল্লাহর জন্য সরে আসছি, সরে আসাতেই দুজনের কল্যাণ। আল্লাহ আমার জন্য এরচেয়েও উত্তম প্রতিদান দেবেন।’

যুদ্ধটা একা একাই করেছি, একদম কাউকেই জানাইনি। আল্লাহ যাতে উভয়কেই বুঝার তাওফিক দেন, কষ্ট সহ্য করার শক্তি দেন, হিদায়াত দান করেন, অনবরত এই দুআ করছিলাম সিজদায় পড়ে।

[১] বুখারি, ৭৩৯০

ফেসবুকের সব ছবি, সব ফানি পোস্ট ডিলিট করে দিয়ে প্রোফাইলটাকে একদম সাদামাটা বানিয়ে ফেলেছিলাম একদিনেই। যোগাযোগের কোনো প্রচেষ্টাতেই রেসপন্স করিনি। মেসেঞ্জারে মেসেজ বা এসএমএস আসলে সাথে সাথে ডিলিট করে দিয়েছি। আমার দিক থেকে নূন্যতম সাড়া আর না পেয়ে, আমি আর সেই আমি নেই বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন পরই আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। আর কোনোদিন আসেনি। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রাথমিক ঝড় সামলানোর পর আরও কিছু কাজ বাকি ছিল। ফোন নাম্বার, এসএমএস, পুরো ফেসবুক কনভার্সেশন ডিলিট করে দিয়েছিলাম। সব গিফট দান করে দিয়েছিলাম। চিঠিগুলো ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ড্রেনে ফেলে দিয়েছিলাম। ফোনে কোনো ছবি রাখতাম না, তাই গ্যালারি ক্লিন করার প্রয়োজন পড়েনি। ওকে এবং ওর সাথে রিলেটেডদের ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে মুছে ফেলেছিলাম তাৎক্ষণিকভাবে। ব্লক করার প্রয়োজন বোধ করিনি। নিজের ওপর সচেতনভাবেই নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিলাম।

তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমার সেই 'অমানুষিক খাটুনি আর মানসিক চাপওয়ালা' চাকরি নিয়ে। ফিরে গিয়েছি সেই আগের জীবনে। প্রচন্ড চাপ আর ব্যস্ততার মাঝে দুঃখবিলাস করার কোনো সুযোগই হয়ে উঠেনি। চাকরির প্রচন্ড চাপ আর ব্যস্ততা একদম মোক্ষম ওষুধ হিসেবে কাছ করেছে জীবনের এই সন্ধিক্ষণে।

তারপর জীবনে অনেক পরিবর্তন। রবের দিকে ফেরার রোমাঞ্চকর এক জার্নি। সেই গল্প আরেকদিন ইনশাআল্লাহ।

সেই যুদ্ধের দুই বছর পর, অনেক অনেক ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর কাছে প্রতি মোনাজাতে দুআ করি একজন চক্ষুশীতলকারিণীর জন্য, ক্ষমা চাই অতীতের অবাধ্যতার জন্য।

বিঃদ্রঃ অনেকেই হয়তো ভেতরে ভেতরে উসখুস করছেন মেয়েটার কী হলো পরে জানার জন্য! হুম, বছরখানেক আগে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। সাবেক সহকর্মীদের সাথে আড্ডায় কথা প্রসঙ্গে তথ্যটা জেনেছিলাম।

ফাঁদে আটকা পড়া ভাইবোনদের জন্য কিছু পরামর্শ:

আমরা যারা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে আছি, একেকজনের রিলেশনের অবস্থা পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে একেকরকম। তবে এখানে একটা জিনিস কমন; সেটা হচ্ছে, আমরা ফিরে আসতে চাই। এবং আন্তরিক নিয়ত থাকলে, দৃঢ় সংকল্প থাকলে আমরা ফিরে আসতে পারব ইনশাআল্লাহ। শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মনে জোর রাখতে হবে। নিচের পয়েন্টগুলো মাথায় রেখে কাজ করলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে আশা করি ইনশাআল্লাহ।

১. 'আমি আল্লাহর জন্য ফিরে আসছি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে স্থায়ী শান্তি অর্জন কখনো সম্ভব না। আল্লাহ তারচেয়েও উত্তম প্রতিদান আমার জন্য রেখেছেন।' এই চিন্তাটা অন্তরে একদম গেঁথে ফেলতে হবে। ওপরের কথাগুলো নিঃসন্দেহে চরম সত্য। আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে যে সম্পর্কগুলো গঠিত হয় এগুলোতে চোখের শীতলতা থাকে না, শান্তি থাকে না। ভুরিভুরি প্রমাণ আমাদের আশেপাশেই আছে। হারাম সম্পর্ক থেকে সরে এসে আমার পুরো জীবনটাই বদলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। হিদায়াতের এই জীবনে অন্যরকম প্রশান্তি। এখন শুধু ভয়ে

# হারাম সম্পর্ক থেকে বের হবার ধাপসমূহ

## দশ ধাপে পরিত্রাণ

১ ‘আমি আল্লাহর জন্য ফিরে আসছি। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে স্থায়ী শান্তি অর্জন কখনো সম্ভব না। আল্লাহ তারচেয়েও উত্তম প্রতিদান আমার জন্য রেখেছেন।’ এই চিন্তাটা অন্তরে একদম গেঁথে ফেলতে হবে।

২ Time will heal everything. সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

৩ মন ভাঙ্গা মাসজিদ ভাঙ্গার সমান’, ‘বদদুআ পড়বে’, ‘কোনোদিন সুখী হবে না’ ব্লা ব্লা ব্লা এসব বানোয়াট টোটকা নিয়ে হাজির হবে অনেকেই। একদম চোখ-কান বন্ধ করে উপেক্ষা করে যান এসব।

৪ কোনো গুনাহ করে ফেললে সেটার জন্য আন্তরিকভাবে তাওবা করতে কখনো বিলম্ব করা যাবে না। জীবনের সবক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য।

৫ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর বিদায়ী সাক্ষাত, বিদায়ী মেসেজ, বিদায়ী আলাপ এসব না করাটা সবচেয়ে উত্তম। একদম বিনা নোটিশে সরে আসুন সম্ভব হলে।

৬ অপর পক্ষের সাথে নিয়মিত দেখা হয়, কথা হয় এরকম মানুষগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। ছবি, মেসেজ, ইনবক্স, ফোন নাম্বার সব ডিলিট করে ফেলতে হবে।

৭ গান শোনা, মুভি-নাটক-মিউজিক ভিডিয়ো টোটালি বাদ। এগুলোও আল্লাহর অবাধ্যতা। অন্তরকে কঠিন করে ফেলবে। আপনাকে সেই হারাম সম্পর্কেই টেনে নিয়ে যাবে।

৮ নিজেকে প্রচন্ড ব্যস্ত রাখতে হবে। ব্যস্ততা অনেক বড় ওষুধ। নিজেকে ব্যস্ত রাখলে শূন্যতা, একাকিত্ব, বিরহ, স্মৃতিকাতরতা গ্রাস করার সুযোগই পাবে না।

৯ পড়ার কোনো বিকল্প নেই। এই জার্নির জন্য মানসিক প্রস্তুতির জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী, সাহাবিদের জীবনী এবং অন্তর নরম হয় এমন বই পড়তে হবে।

১০ আপাত দৃষ্টিতে যে অভ্যাসটা ছাড়া আপনার জন্য রীতিমতো অসম্ভব মনে হচ্ছে, জাস্ট তাহাজ্জুদে দাড়ানোর অভ্যাসটা রপ্ত করুন। মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে দেখবেন ইনশাআল্লাহ। ধূমপান, মাদকাসক্তি, হারাম সম্পর্কসহ যেকোনো ধরনের আসক্তি দূরীকরণে তাহাজ্জুদ অনেক কার্যকরী একটা ইবাদাত।

ভয়ে একটা দুআই করি–'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে দ্বীনের ওপরেই স্থির রেখো।'

২. Time will heal everything. সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। ক্লোজ বন্ধুদের যারাই ব্রেকআপ খেয়ে আমার হেল্প চাইতে এসেছে সবাইকে আমি এই কথাটাই সবার আগে বলেছি, এবং সেটাই সত্যি হয়েছে পরে। ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে শিখেছে সবাই। কারও জীবন কারও জন্য থেমে থাকেনি। সময় সব ক্ষত সারিয়ে দিয়েছে। যার যার পথে সে এগিয়ে গেছে। একজন ব্যক্তিত্ববান মানুষের জন্য এটাই আদর্শ পদ্ধতি। সুইসাইড করা বা বিড়িখোর-গাঞ্জাখোর হয়ে যাওয়া, স্মৃতি আকঁড়ে পরে থেকে দুঃখবিলাস করা, এগুলো দুর্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। 'ওকে ছাড়া ক্যামনে বাচঁব' বা 'ও আমাকে ছাড়া ক্যামনে বাঁচবে' এইসব আবেগী চিন্তাধারা বাদ দিয়ে নিজের পথ ধরুন একদম স্বার্থপরের মতো। এই মানসিকতা ধারণ করতে পারলেই সাময়িক আবেগের ভাঙ্গা ঘাট পেরিয়ে স্থায়ী সুখের বন্দরে নোঙর করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

৩.'মন ভাঙ্গা মাসজিদ ভাঙ্গার সমান', 'বদদুআ পড়বে', 'কোনোদিন সুখী হবে না' ব্লা ব্লা ব্লা এসব বানোয়াট টোটকা নিয়ে হাজির হবে অনেকেই। একদম চোখ-কান বন্ধ করে উপেক্ষা করে যান এসব। হারাম থেকে বেরিয়ে আসুন। বাকিটা আল্লাহর হাতে।
হারাম সম্পর্ক থেকে সরে আসবেন এই নিয়ত করার পর সেটা নিয়ে কারও কাছেই পরামর্শের জন্য যাওয়ার দরকার নেই। কুবুদ্ধি দিয়ে আপনাকে হারামেই ফিরিয়ে আনবে আবার। এটাই হয় বেশিরভাগ। একা একাই লড়াই চালান। আল্লাহ আছেন সাথে।

৪.কোনো গুনাহ করে ফেললে সেটার জন্য আন্তরিকভাবে তাওবা করতে কখনো বিলম্ব করা যাবে না। জীবনের সবক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। গুনাহ করে তাওবা করলে আল্লাহ সেই গুনাহ থেকে বেরিয়ে আসার পথ সহজ করে দেন। আমরা যারা হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে আছি, আসুন আগে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে তাওবা করি, ক্ষমা চাই, ফিরে আসার জন্য আন্তরিকভাবে সংকল্প করি।

৫. ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর বিদায়ী সাক্ষাত, বিদায়ী মেসেজ, বিদায়ী আলাপ এসব না করাটা সবচেয়ে উত্তম। একদম বিনা নোটিশে সরে আসুন সম্ভব হলে। অনেক ভাই শেষবার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। সিদ্ধান্ত জানিয়ে মেসেজ দিলেন ঠিক আছে, ফিরতি মেসেজে যে আবেগের ঝাপটা আসবে সেটা সামলে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি আছে তো? না কি আবেগের ঠ্যালায় আবার ভেসে যাবেন?

৬. ফিরে আসার পর খুব জোরেশোরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালাতে হবে। একদম চিরুনি অভিযান যাকে বলে। অপর পক্ষের সাথে নিয়মিত দেখা হয়, কথা হয় এরকম মানুষগুলোকে এড়িয়ে যেতে পারলেই সবচেয়ে ভালো। ছবি, মেসেজ, ইনবক্স, ফোন নাম্বার সব ডিলিট করে ফেলতে হবে। ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে ছাঁটাই করতে হবে। সব গিফট কাউকে দান করে দিতে হবে, নাহয় ডাস্টবিনে ফেলতে হবে সোজা। একদম ভাবলেশহীন চিত্তে কাজগুলো সারতে হবে। কোনো অজুহাতে পিছপা হওয়া চলবে না। সামান্যতম চিহ্নও রাখা যাবে না। স্মৃতি মনে পড়ে যাবে এরকম সব ব্যাপার থেকে সতর্ক থাকতে হবে। পরবর্তীতে কোনো মেসেজ, কল

আসলে সাবধানতার সাথে এড়িয়ে যেতে হবে। স্মৃতি মনে পড়ে গেলেই ইসতিগফার পড়তে হবে সাথে সাথে। স্মৃতিগুলোকে পশ্রয় দেয়া যাবে না।

৭.গান শোনা, মুভি-নাটক-মিউজিক ভিডিয়ো টোটালি বাদ। এগুলোও আল্লাহর অবাধ্যতা। অন্তরকে কঠিন করে ফেলবে। আপনাকে সেই হারাম সম্পর্কেই টেনে নিয়ে যাবে। দৃষ্টি হিফাযত করতে হবে, গুনাহ থেকে বাঁচতে হবে। তবেই এই দৃষ্টির শীতলতার ব্যবস্থা করে দেবেন আল্লাহ। হারাম সম্পর্ক বাদ দেয়ার নিয়ত যে করতে পারে, তার জন্য এসব ছেড়ে দেয়া কোনো ব্যাপারই না ইনশাআল্লাহ। ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে সব নন-মাহরাম ছাঁটাই হবে একদম নির্দয়ের মতো। ফেসবুকে 'ভালোবাসার ফুল', 'প্রেমের যন্ত্রনা' টাইপের যত পেইজ-গ্রুপ আছে সব আনফলো করে দিতে হবে। প্রেমের গল্প-উপন্যাস পড়া বাদ দিতে হবে। ওপরের সব বিষয়ের খুব ভালো বিকল্প আমাদের আছে। জাস্ট একটু খুঁজে নিতে হবে। এতটুকুই।

৮. নিজেকে প্রচন্ড ব্যস্ত রাখতে হবে। ব্যস্ততা অনেক বড় ওষুধ। নিজেকে ব্যস্ত রাখলে শূন্যতা, একাকিত্ব, বিরহ, স্মৃতিকাতরতা গ্রাস করার সুযোগই পাবে না। অবসর, একাকিত্ব এগুলো আপনাকে তিলে তিলে শেষ করে দেবে। এমন ব্যস্ত থাকতে হবে যাতে রাতে শোয়া মাত্রই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে পারেন।প্রচন্ড খাটুনিওয়ালা চাকরিতে ব্যস্ত না থাকলে আমি ফিরে আসতে পারতাম কি না সেটা নিয়ে আমি খুবই সন্দিহান। সিরিয়াসলি।

৯. পড়ার কোনো বিকল্প নেই। এই জার্নির জন্য মানসিক প্রস্তুতির জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী, সাহাবিদের জীবনী এবং অন্তর নরম হয় এমন বই পড়তে হবে।

১০. সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মূল্যবান পরামর্শ -

'নিশ্চয়ই ইবাদাতের জন্য রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণে অনুকুল।'[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই'। অতএব কুপ্রবৃত্তি দমনে তাহাজ্জুদের ভূমিকা আশা করি আর খুলে বলতে হবে না।তারপরও নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আপাত দৃষ্টিতে যে অভ্যাসটা ছাড়া আপনার জন্য রীতিমতো অসম্ভব মনে হচ্ছে, জাস্ট তাহাজ্জুদে দাড়ানোর অভ্যাসটা রপ্ত করুন। মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।
ধূমপান, মাদকাসক্তি, হারাম সম্পর্কসহ যেকোনো ধরনের আসক্তি দূরীকরণে তাহাজ্জুদ অনেক কার্যকরী একটা ইবাদাত।

তাহাজ্জুদে দাড়ানোর অনুপ্রেরণার জন্য একটা বই সাজেস্ট করছি, আমার খুবই প্রিয় একটা বই। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল-এর 'কিয়ামুল লাইল'। ৩০ পৃষ্ঠার ছোট্ট একটা বই, কিন্তু তাহাজ্জুদের ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক আলোচনায় একদম ঠাসা!হারাম সম্পর্ক নিয়ে যখন সংগ্রাম করছিলাম তখনই হাতে আসে বইটি। পড়ার পর খুবই অনুপ্রাণিত হই মাশাআল্লাহ! বইটি পড়ার দিন থেকে তাহাজ্জুদে দাড়ানোকে অভ্যাসে পরিণত করতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি। তাহাজ্জুদে দাঁড়ানোর অভ্যাস করার পর থেকে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

শীতকাল হোক আর গ্রীষ্মকাল হোক, খাওয়াদাওয়া, ঘুম আর শারীরিক সক্রিয়তা

[২] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৬

নিয়ে একটু সচেতন হলে, লাইফস্টাইলে একটু ইতিবাচক পরিবর্তন আনলে আর ইস্পাত কঠিন সংকল্প থাকলে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলাটা মোটেই কঠিন কিছু না। আর তাহাজ্জুদের অভ্যাস যার আছে তার ফজরও মিস হবে না ইনশাআল্লাহ।
তাহাজ্জুদ এবং ফজর আদায় করে শয়তানের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে জয়ী হয়ে দিন শুরু করা গেলে দিনের বাকি সময়টাতেও শয়তান বারে বারে পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ।

শেষকথা:

ফিরে আসাটা একদিনের কাজ না। এটা একটা প্রসেস, একটা জার্নি। এই জার্নি শেষ করতে গিয়ে আগের 'আমি' আর বর্তমান 'আমি' কে অনেক বেশি বদলে ফেলতে হবে। পুরো লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। হারাম সম্পর্ক পরবর্তী মুক্ত-স্বাধীন জীবনটা অনেক শান্তিময় আলহামদুলিল্লাহ।

হারাম সম্পর্কের জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসি চলুন। যে চক্ষুশীতলকারিণী আল্লাহ আমাদের জন্য ঠিক করে রেখেছেন তার যোগ্য হওয়ার জন্য পুরোদমে কাজে লেগে পড়ি চলুন। চরিত্র সংশোধনের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিই চলুন। আল্লাহ আমাদের পথচলা সহজ করে দিন। আমীন।

# অতঃপর, হাসনাহেনা হেসেছিল

লস্ট মডেস্টি

## ১

সোফার উপর সটান বসে আছি। সামনে গম্ভীর মুখে বসে আছেন খালুজান। জরুরি তলব করে আনানো হয়েছে আমাকে। যেহেতু জরুরি তলব সেহেতু ঝামেলা কিছু একটা যে আছে সেটা খুব টের পাচ্ছি।

'খালা, রাহাতকে দেখছি না যে..'

'দেখবা। ওরে দেখানোর জন্যেই ডাকছি তোমাকে।' গোমড়ামুখেই খালুজানের উত্তর। খালা নিশ্চুপ।

রাহাত হলো আমার একমাত্র খালাত ভাই। বাপ-মায়ের আদরের দুলাল। ছোট বড় কোনো আবদারই ওর অপূর্ণ রাখেন না খালা-খালুজান।

যে কেউ হয়তো ভেবে বসতে পারে- আদর পেয়ে বখে যাওয়া কোনো ছেলেই হবে বোধহয়!

কিন্তু না, আর দশটা ছেলের মতো নয় রাহাত। বেশ ব্রিলিয়ান্ট। জেএসসিতে ওদের স্কুলের হাইয়েস্ট মার্কস পেয়ে সরকারি স্কলারশিপও বাগিয়ে নিয়েছে।

ওকে নিয়ে তো কোনো ঝামেলা হবার কথা না। কাহিনিটা কী?

## ২

'দরজা খোল, ব্যটা! আমি তোর মাসুদ ভাই..'

মিনিট খানেক পরে দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিয়েই রাহাত খাটের ওপর গিয়ে বসেছে। মাথা নিচু।

'কী রে! এতদিন পরে এলাম। কেমন আছি না আছি - কিছু তো বলবি না কি?!'

মাথা তোলার পর সবার আগে নজরে এল চোখজোড়া। কত রাত ঘুমায় না কে জানে!

পাশে বসতে বসতে পিঠে হাত রাখতেই বুঝলাম গায়ে হালকা জ্বর।

'কীসব কাণ্ড করিস বল তো! বাপ মায়ের ওপর কেউ রাগ করে? উনারা তোকে কত ভালোবাসেন।

সামান্য ভিডিয়ো গেমস নিয়ে এত্ত রাগ!'

সমস্যার আদ্যোপান্ত খালা বলেছে আমাকে। জেএসসির পরে একটা ট্যাব কিনে দিতে বলেছিল রাহাত। ছেলের ভালো রেসাল্টের বিপরীতে এই আবদার ফেলার কোনো সুযোগই ছিল না। খালুজান একটু গাইগুই করলেও পরে আর 'না' করেননি। ছেলে খুশি তো তারাও খুশি!
কিন্তু সমস্যা দেখা দিল দিন কয়েক বাদে।

ডিভাইস পেয়ে ছেলে তো নাওয়া-খাওয়া ভুলবার জোগাড়। সারাদিন ওসব নিয়ে পড়ে থাকে নিজের রুমে। পাগলের মতো অবস্থা।

পড়াশুনাও শিকেয় উঠেছে। মিডটার্ম পরীক্ষায় নাকি অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। ফিজিক্সে পেয়েছে ৪৪! আনবিলিভেবল!

গতরাতে খালুজান খেতে বসে ডাকাডাকি করেও ওকে যখন টেবিলে আনতে পারলেন না, তখন উঠে গিয়ে ট্যাব-টাই কেড়ে নিলেন। সাথে সাথে ওটা চলে গেল লকারে। বোনাস হিসেবে বাসার

ওয়াই-ফাই লাইন বন্ধ!

তুমুল কাণ্ড।

রাহাতও কম যায় না। চিৎকার চেঁচামেচি করে শেষে না খেয়েই ঘরে খিল দিয়ে আছে কাল থেকে। বন্ধ দরজা খুলল আমি আসার পর।

'চল, উঠ! বাইরে খেতে যাব। তোর সাথে অনেকদিন বাইরে খাই না।'

হাত ধরে টেনে তুলে ওয়াশরুমে পাঠালাম অভিমানী ভাইটাকে।

## ৩

খাবারের অর্ডার দিয়ে রাহাতকে বললাম,

'তোর বাগানের কী খবর বল তো.. সেই যে খুঁজে খুঁজে কোত্থেকে কী একটা ফুল এনেছিলি না? কী যেন নাম?'

'হাসনাহেনা। মরে গেছে বোধহয়, ভাইয়া। জানি না আমি। ছাদে যাওয়া হয় না অনেকদিন। ওসব আর ভাল্লাগে না!'

'বলিস কী! এত শখ করে করলি সব। এখন বলছিস ভাল্লাগে না!'

বার্গার চলে এসেছে, লাচ্ছি আসতে একটু দেরি হবে বলল। হোক, আমার হাতে অফুরন্ত সময়। তাছাড়া এরা লাচ্ছিটা বানায় একদম পার্ফেক্ট। সোজা বাংলায়- অসাধারণ!

''নে- শুরু কর। বিসমিল্লাহ..

আচ্ছা, আমাকে বল তো, দিনে এভারেজ কতক্ষণ গেম খেলে কাটাস তুই?'

'উমম.. কতই বা আর হবে.. আধ ঘণ্টা, বড়জোর এক ঘণ্টা.. এর বেশি তো না!'

আমতা আমতা করে বলল রাহাত। অথচ খালা আমাকে বলেছে, ও নাকি দিনের ম্যাক্সিমাম টাইম-ই ডিভাইস নিয়ে পড়ে থাকে। মাঝে তো স্কুলও কামাই দিয়েছে ক'দিন!

রাহাত যে এভাবে আমার কাছে মিথ্যে বলবে সেটা আমি আশা করিনি। কিছুটা রাগ হলেও আপাতত সামলে নিলাম।

'তুই কি জানিস একটা নিরীহ অভ্যেস কিন্তু আসক্তি হয়ে উঠতে পারে? এবং সেটা তখন আর মোটেই নিরীহ থাকে না। বরং খুবই বাজে একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আমার ক্যাম্পাসের এক বড় ভাইয়ের গল্প শোন। দিনে দুই প্যাকেট সিগারেট ছাড়া তার চলেই না। একদম হিসেব করা। কোনোদিন যদি একটাও কম হয় সেদিন নাকি তার সকালের কাজটা ক্লিয়ার হয় না! চিন্তা কর অবস্থা!'

রাহাত ফিক করে হেসে ফেলল। এই ছেলের হাসিতে একটা আশ্চর্য মায়া আছে। আগে কখনো খেয়াল করিনি।

'কী আজব! সিগারেটের সাথে টয়লেটের সম্পর্ক কী?'

'এটাই তো কথা, এটা তার সাইকোলজিক্যাল সমস্যা। আসক্তি এতটাই ভয়ংকর। অথচ মজার ব্যাপার হলো, তার শুরুটাও ছিল সপ্তাহে একটা সিগারেট দিয়ে, তাও আবার বন্ধুরটা শেয়ার

করে।

গেমসের ব্যাপারটাও তা-ই। ধরে নিলাম তুই খুব কম সময়ই খেলিস। আসক্তি না, শখ। কিন্তু এটা যদি আসক্তির পর্যায়ে চলে যায়, সেটা কি খুব ভালো কিছু হবে? খারাপ হবে না?'

রাহাত মাথা নেড়ে শুধু বলল, 'হু।'

'আচ্ছা, তুই আমাকে বল তো, কী করে বুঝবি যে ব্যাপারটা 'আসক্তি' পর্যায়ে চলে গেল কি না?'

'কী করে?' বার্গার মুখে দিতে দিতে পালটা প্রশ্ন রাহাতের।

'বলছি শোন...

কিছু সিম্পটমস, মানে লক্ষণ দেখার মাধ্যমে খুব সহজেই বুঝতে পারবি ব্যাপারটা। যেমন ধর-

অতিমাত্রায় খেলতে ইচ্ছে করবে। না খেলতে পারলে ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি লাগবে। কিছুই ভালো লাগবে না।

রাত জেগে খেলার অভ্যেস তৈরি হবে। না ঘুমিয়েই রাত কেটে যাবে পুরো রাত। ফলে সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থেকেই যাবে। কাজে মন দিতে পারবে না।

দিন-রাত পার করে দিবে গেমস খেলে কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে- মাত্রই তো ফোনটা নিলাম, আধা ঘণ্টা খেলেছি খালি! গেমস নিয়ে মিথ্যে বলার হার বেড়ে যাবে। দৈনন্দিন কাজকর্মগুলোও সময়মতো করবে না। এমনকি অনেকের তো খাবার কথাও মাথায় থাকে না। খেলেও খাবে একাকী। সবার সাথে খাবে না। দেখা গেল এক হাতে খাচ্ছে, অন্য হাতে গেমস। একা থাকতেই বেশি পছন্দ করবে। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো এড়িয়ে যাবে।

খেলার সময় কেউ কোনো দরকারি প্রয়োজনে ডাকলেও মেজাজ বিগড়ে যাবে।

পড়াশোনার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্ম নিতে শুরু করবে। একসময় যে কাজগুলো সে ভালোবেসে করত, সেসব কাজও তখন পানসে মনে হবে। ক্রিয়েটিভিটি (সৃষ্টিশীলতা) কমতে থাকবে।

এগুলো একদম সাধারণ কিছু লক্ষণ। আরও অনেক আছে। সেসব না হয় থাক। তোর সাথে কিছু মিলে গেল কি না তা-ই বল!'

এর মধ্যে কখন যেন ওয়েটার এসে লাচ্ছি দিয়ে গেছে। আমি কথার ফাঁকে খেয়াল-ই করিনি।

বার্গার শেষ করে বরফ দেয়া লাচ্ছিতে চুমুক দিচ্ছে রাহাত। একটু থেমে বলল-

'সব না, তবে কয়েকটা মিলেছে।'

'আচ্ছা! আচ্ছা!'

হঠাৎ রেস্টুরেন্টের ডান পাশের এক রাস্তায় গোলমাল দেখা দিল।

'ভাই, একটু...'

রাহাত উঠে গিয়ে জানালা থেকে ঘুরে আসল, মুখটা একটু থমথমে। 'এক রিকশার সাথে সাইকেল বেঁধে গিয়েছে', এসে আমাকে জানাল রাহাত।

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা-

'তোর বোধহয় চশমা নিতে হবে রে। চোখের তো বারোটা বাজিয়ে ফেলেছিস!

আমি তো এখানে বসেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, কী কাহিনি ঘটেছে। তোর উঠে গিয়ে দেখতে হলো!'

রাহাতের মুখটা যেন আরও মলিন হয়ে গেল।

কৃত্রিম রাগী সুরে বললাম-

'রাত দুপুর সারাক্ষণ স্ক্রিনে ডুবে ডুবে গেমসে "অ্যাটাক" দিয়ে বেড়াস, আর এদিকে তোর শরীরেই অলরেডি অ্যাটাক শুরু হয়ে গেছে। আজ চোখ গেছে, কাল মাথা যাবে!'

'ধুর, ভাই! এখন আবার বইল না যে, গেইম খেলতে খেলতে পাগল হয়ে যাব..'

'তো যাবিই তো। পাগল হয়তো হবি না, বাট মানসিক সমস্যায় তো পড়বিই যা 'Gaming Disorder' নামে পরিচিত।'

রাহাতের চোখে মুখে খানিকটা অবিশ্বাসের ছায়া। তবে আমার প্রতি ওর সুধারণা এতটাই প্রকট যে, ঠিক অবিশ্বাসও করতে পারছে না।

ভ্রান্তির ছায়া দূরে সরিয়ে দিতে ফোনটা বের করে তখনই গুগল করে ওকে দেখালাম-
‘নে! দেখ..’
বেশ কয়েকটা আর্টিকেল ঘুরে ঘুরে দেখা শেষে হতাশ ছেলেটাকে বললাম-
‘তাহলে কী বুঝলি বল তো? কতটা ক্ষতি আর কতটা লাভ?
আচ্ছা, আমি সামারাইজ করি, শোন..

শারীরিক ক্ষতি:
দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, ঘুমের সমস্যা, ক্লান্তি, খাওয়ায় অরুচি।
মানসিক ক্ষতি:
মেজাজ তিরিক্ষি, অতিরিক্ত চাপ, সাথে পারিবারিক আর সামাজিক ক্ষতি তো আছেই।

সময় নষ্ট, টাকা নষ্ট, পড়াশুনা-ক্যারিয়ার নষ্ট! আলিমগণ তো এসব গেইমকে নাজায়িয বলেছেন। গেমকে নাজায়িয বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন। অতএব, ইসলামিক দিক বিবেচনা করলেও এসব গেমস হলো ‘লস প্রজেক্ট’।

জীবনটাকে নষ্ট করার সব উপাদান এখানে একসাথে। একের ভেতর সব। আর বিনিময়ে লাভের খাতায় কিছু হাস্যকর সুখানুভূতি ছাড়া কিছুই নেই। তোর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলে এই নোংরা জলে ভেসে যাবে, এটাও আমাকে মানতে হবে?’
‘স্যার, আর কিছু লাগবে?’
‘না ভাইয়া, থ্যাংকস! বিলটা দিন।’
বিল পে করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে রিকশা নিলাম। রাহাত কিছু বলছে না। হয়তো নিজের মনের সাথে বোঝাপড়া করছে। অথবা কে জানে কত মাস পরে হয়তো মুক্ত বাতাসে মন ভরে একটু শ্বাস নিচ্ছে। নিতে থাকুক।

## ৪

রাহাত যখন কল দিয়েছিল আমি তখন ভার্সিটির ল্যাবে। তোফাজ্জল স্যারের ক্লাস। কল রিসিভ করার কোনো জো ছিল না।
ক্লাস শেষে কল ব্যাক করতে ফোন খুলে দেখি রাহাতের ছোট্ট মেসেজ-

‘মাসুদ ভাই!

হাসনাহেনা গাছে নতুন ফুল এসেছে। যা সুন্দর ঘ্রাণ ছড়ায়! আমি তো এখন ছাদেই টং এর মতো বসার জায়গা বানিয়ে নিয়েছি। ওখানেই পড়ি।

তুমি যদি এবার বাসায় আসো, তাহলে তো আর যেতেই চাইবে না!

ওহ.. আর, ট্যাবটা বাবাকে বলে অনলাইনে বিক্রি করে দিয়েছি। আপাতত আমার ওসব লাগছে না। বিক্রির টাকা কী করেছি জানো?

বই কিনেছি! ঐ যে তুমি একবার একটা লিস্ট দিয়েছিলে যে.. লিস্ট ধরে ধরে পড়ছি। আচ্ছা ভাইয়া, নতুন বই আর হাসনাহেনা কোনটার ঘ্রাণ বেশি সুন্দর?

একদমে পুরো মেসেজটা পড়ে নিলাম। বুকের ভেতর থেকে কেমন একটা অদ্ভুত প্রাচীন বাতাস শিরশির বেরিয়ে এল। কেন যেন একটু শব্দ করেই বলে ফেললাম- আলহামদুলিল্লাহ!

তথ্যসূত্রঃ
১. What are the Signs of Video Game Addiction?- https://tinyurl.com/rsbhkw
২. Inclusion of “gaming disorder” in ICD-১১- https://tinyurl.com/ppdpt৮jj
৩. Game Theory: The Effects of Video Games on the Brain- https://tinyurl.com/৪v৯jwz৫a

# ফড়িং

তানযিল আমীন শুভ

আমি মিশে রবো যমুনার কালো জলে,
আমি ছুটে বেড়াব বিল ভর্তি শাপলাদের দলে,
কখনো আমি দক্ষিণা বাতাস হব
ছুঁয়ে যাব ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ জনশূন্য রেললাইন।
কখনো আমি পথিকের চোখ জুড়ানো পথ হব
না হয় পথের ধারের গাছ হব
হব শেওলা ধরা দেয়ালের ধারে ফুটে থাকা বুনো টগর ফুল,
কখনো পুকুর ধারের কদম গাছ হব,
কখনো হব খেয়াঘাটের বকুল তলায় চকচকে পানিতে ঝরে পড়া বকুল ফুল।

কখনো আমি একটা ঘুড়ি হব
মেঘের পাহাড়ে ভেসে বেড়াব,
এক ভোরে আমি সূর্য উঠা দোয়েল হব,
সুযোগ পেলে পানির তলার মাছ হব,
না হয় একটা রাখাল হব
ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠের পরে মাঠ চড়ে বেড়াব।
এসব কিছু না হতে পারলে
না হয় একটা ফড়িং-ই হব
মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে যেদিক খুশি উড়ে বেড়াব।

# চলো গল্প শুনি

**আসিফ আদনান**
লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক

**সেই** মানুষটার গল্প বলি। হয়তবা আগে শুনেছ, তবুও আবার বলি। সেই দিনের কথা বলি যা এখনো আসেনি, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই আসবে। সেই সময়টার কথা বলি, যা তুমি ভুলে গেছ। কিন্তু অবধারিতভাবে যা তোমাকে গ্রাস করবে।

পুনরুত্থানের দিন। জড়ো করা হয়েছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের। মানবজাতি অসহায়, সন্ত্রস্ত, অপেক্ষমান। চিন্তিত, অস্থির, অক্ষম। সেইদিন মানুষ তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্য আর্জি নিয়ে দুনিয়ার রাজাদের কাছে যাবে না। দুনিয়ার শাসকদের কাছে যাবে না। তারা ছুটে যাবে আল-আম্বিয়ার (নবিদের) কাছে – আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম।
মানুষ প্রথম ছুটে যাবে মানবজাতির পিতা আদমের কাছে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। তারা আদম আলাইহিস সালাম-এর কাছে গিয়ে বলবে…

‘হে আদম, আপনি কি মানুষের অবস্থা দেখছেন না? অথচ আল্লাহ আপনাকে নিজের বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে তিনি তাঁর ফেরেশতাগণ দিয়ে সিজদাহ করিয়েছেন। আর আপনাকে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন। কাজেই আপনি আমাদের রবের কাছে সুপারিশ করুন, যেন এ স্থান থেকে আমাদেরকে তিনি স্বস্তি দেন।’

আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলবেন - এ কাজের জন্য আমি উপযুক্ত নই। আমাদের পিতা আদম নিজের ভুলের কথা স্মরণ করবেন এবং মানুষকে বলবেন মানবজাতির প্রতি প্রেরিত প্রথম রাসূল নূহ-এর কাছে যেতে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তারা নূহ আলাইহিস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর কৃত ভুলের কথা স্মরণ করবেন, এবং মানুষকে বলবেন আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের কাছে যেতে, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও তাদের কাছে স্বীয় ভুলের কথা উল্লেখ করে বলবেন- আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মূসার কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি সরাসরি কথা বলেছিলেন।

তারা তখন মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের যোগ্য নই। তাদের কাছে তিনি নিজের ভুলের কথা উল্লেখ করবেন এবং বলবেন, তোমরা বরং ঈসার কাছে যাও। যিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, কালিমা ও রূহ। আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম।

তখন তারা ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম-এর কাছে যাবে। তখন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও। তিনি এমন এক বান্দা, যার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা – আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম। তাঁরা কেউ সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। প্রত্যেক নবি নিজেদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করবেন।

তারপর সবাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাবে। তিনি তাঁর রবের কাছে অনুমতি চাইবেন এবং তাঁকে অনুমতি দেয়া হবে। তিনি তাঁর রবের সামনে সিজদাহবনত হবেন। আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি, বিচারদিনের মালিক আল্লাহ আযযা ওয়া জাল যতক্ষণ ইচ্ছে করবেন ততক্ষণ মুহাম্মাদ ﷺ সেই অবস্থায় থাকবেন।

তারপর তাঁকে ﷺ বলা হবে,
‘হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠান। বলুন, শোনা হবে। চান, দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হবে।

মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবের শিখিয়ে দেয়া প্রশংসার দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবেন এবং বলবেন,

**‘উম্মাতি, উম্মাতি**
**(আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ)’**

সমগ্র মানবজাতি, এমনকি নবিগণ আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম নিজ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্ত্রস্থ থাকবেন। সবাই নাফসি, নাফসি করতে থাকবেন। মুহাম্মাদ ﷺ বলবেন, আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ![১]

এই সেই মানুষ যার সুন্নাহকে আজ আমরা তুচ্ছ করছি। সেই মানুষ যার অপমান, অবমাননা আমরা নির্বিকারভাবে সয়ে যাচ্ছি। যার অবমাননাকারীদের আমরা নির্বিঘ্নে আগ্রাসন চালিয়ে যেতে দিচ্ছি। এটা হলো সেই মানুষটা, যিনি গভীর রাতে সালাতে দাঁড়িয়ে তোমার আর আমার কথা চিন্তা করে কাঁদতেন। যিনি বারবার আল্লাহর কাছে তাঁর উম্মাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

এটা হলো সেই মানুষটা যিনি আমাদের দেখেননি, কিন্তু আমাদের জন্য বারবার চিন্তিত হয়েছেন, কান্না করেছেন, দুআ করেছেন। এটা হলো সেই মানুষটা, যিনি সুপারিশ করবেন, সেই ভয়ঙ্কর দিনে, তাঁর উম্মাহর জন্য। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

এই মানুষটার কথা স্মরণ করো। যেই মহান সত্ত্বা তাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর ব্যাপারে সচেতন হও। নিজের পরিবার, আর প্রাণের জন্য ভালোবাসাকে এক পাল্লায় তুলে এই মানুষটার জন্য তোমার মনে যে ভালোবাসা আছে সেটাকে অন্য পাল্লায় রাখো। দুনিয়ার মায়া, সম্পদ, গা-বাঁচানো জীবনকে এক পাল্লায় তোলো আর রাসূলুল্লাহর সম্মানের প্রশ্নকে আরেক পাল্লায় তোলো।

পুরো পৃথিবীকে এক পাল্লায় তোলো আর মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-কে আরেক পাল্লায় তোলো। আর বিচার করো, তুমি আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কতটুকু ভালোবাসো। নিজেকে প্রশ্ন করো, এই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দায়িত্ব তুমি কতটুকু পালন করেছ। চিন্তা করো, যদি হাশরের দিন তাঁর ﷺ সাথে তোমার দেখা হয়, আর এই প্রশ্নগুলো তিনি ﷺ তোমাকে করেন, তাহলে কী জবাব দেবে?

**অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ালু**

**৯:১২৮**

[১] বুখারি, ৭৫১০; মুসলিম, ১৯

# শেষ ঠিকানা

জাহিদুল ইসলাম তামিম

১. বস্তির পোলাপানগুলো বেজায় বদ হয়ে গিয়েছে। ছোট ছেলেপেলেগুলোকে নিয়েও কীসব করে বেড়ায়। বাসায় আজকে বাবা নেই বলে আহমাদকে তার সাথে নিজের খালাম্মার বাসায় নিয়ে এল রাবেয়া। খালাম্মা বলতে রাবেয়া যার বাসায় কাজ করে সে। তিনদিন যাবৎ জ্বরে পুড়ছে রাবেয়া। দুইদিন কাজে যায়নি তাই। তার খালাম্মা এজন্য বেজায় নাখোশ। আজ যেতেই হবে। কোনো ধরনের বাহানা চলবে না, বলে দিয়েছেন খালাম্মা। ঝা চকচকে ফ্ল্যাট বাড়িটার ড্রয়িং রুমের মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়েছে আহমাদকে।

আহমাদ বুঝতে পারছে না, কী করবে বসে বসে। মাকে কত করে বলল সে আসতে চায় না। আবেদন তো গৃহীত হয়নি, তার ওপর মাথায় কতগুলো চাটি পড়েছে। ড্রয়িং রুমের একটা টেবিলের ওপর কতগুলো খেলনা দেখতে পেল সে। সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা। একটা ঘোড়া দেখতে পেল, সেটার ওপর একটা মানুষ বসা। এগিয়ে গিয়ে উঠিয়ে নিল খেলনাটা। কিছুক্ষণ এটার সাথেই সময় ক্ষেপণ করার সীদ্ধান্ত নিল সে। ঠিক তখনই খালাম্মা এসে হাজির। এসেই ধমক দিয়ে উঠলেন তিনি,

‘হাতে কী ওইটা তোর? মগের মুল্লুক পেয়েছিস, যা খুশি তাই করবি? চুরি করার ধান্দা, না?’

চিৎকার শেষ করে আহমাদের হাত থেকে খেলনাটা কেড়ে নিলেন তিনি। ততক্ষণে রাবেয়াও ভেতরের ঘর থেকে চলে এসেছে। জ্বরের প্রকোপে মাথাটা ভনভন করছে তার।

‘ছোটলোকের বাচ্চা সব তোরা। মিথ্যা বাহানা করে কাজে আসে না একজন আর তারই ছেলে এদিকে চুরি করছে।’

রাবেয়া তার খালাম্মার চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার সাথে সবসময়ই বাজে আচরণ করেন তিনি। নিজের ছেলেকেও রন্ধ্রে রন্ধ্রে চেনে সে। আর যাই হোক চুরির শিক্ষা সে ছেলেকে কখনো দেয়নি। খালাম্মাকে কিছু বলেও লাভ হবে না। এখানে তার দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছু করার নেই।

ততক্ষণে আহমাদের গালে দু চারটা চড়-থাপ্পড় পড়ে গিয়েছে। চকচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সে। নিজেকে একটা অপদার্থ মনে হচ্ছে তার। হোক না এগারো বছরের শিশু, আত্মসম্মান তো আছে, না কি? গাল বেয়ে দু ফোঁটা নোনা পানি গড়িয়ে পড়ে নিচে। ঝকঝকে মেঝের ওপর অশ্রুবিন্দুগুলোকে শিশিরের মতো দেখায়।

‘খালাম্মা, মাফ কইরা দেন, ছোড পোলা বুঝে নাই।’ তামাশা না দেখতে পেরে কাকুতি বেরিয়ে এল রাবেয়ের মুখ থেকে।

‘নিজের অবস্থান বুঝিস না? তোরা ছোটলোক, ছোটলোকের মতো থাকবি। জানি তো তোদের স্বভাব ভালো না। চুরি করার জন্য তক্কে তক্কে থাকস। এই ছেলেকে আর কোনোদিন আনবি না, বুচ্ছস?’ ক্রোধান্বিত খালাম্মা বলে উঠলেন।

‘জে, খালাম্মা বুচ্ছি।’

কথা শেষ করেই মুখ ঝামটা দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন বাড়ির কর্ত্রী। হাটার মাঝে অস্বস্তিকর দাম্ভিকতা।

২.

রাবেয়া ভেবেছিল কাজ শেষে বের হয়ে ছেলেকে আচ্ছা ঝাড়ি দেবে। কিন্তু শরীরে তেমন শক্তি নেই। জ্বরটা কাবু করে ফেলেছে তাকে। এরকম দুর্বল কখনোই অনুভব হয়নি। হাটতেও হচ্ছে অনেক কষ্ট করে।

মায়ের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে আতকে উঠে আহমাদ। ছোট হলেও বুঝতে পারে যে মায়ের শরীর ঠিক নেই।

৩.

খালেদ ঘরের দরজার বাইরে বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। স্ত্রী তার আজ দুপুরেই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। সে ভেবেছিল, সামান্য জ্বর-ই তো। এমনিই সেরে যাবে। তিনদিন বিছানায় দিনাতিপাত করার পর দুপুরের দিকে আহমাদ বলল, তার মা না কি নড়ছে না। দৌড়ে ডাক্তার ডেকে এনেছিল সে। কিন্তু না, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। রূহ দেশান্তরি হয়ে গিয়েছে। ফিরিয়ে আনার সাধ্যি কারও নেই। ছোট আহমাদ তাকিয়ে আছে মায়ের নিথর দেহটার দিকে। দেখে মনে হয় ঘুমাচ্ছে।

৪.

মাসজিদের পাশের কবরস্থানটাতেই কবর দেয়া হবে রাবেয়াকে। শেষ বারের মতো মায়ের মুখখানা দেখে নিল আহমাদ। কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শুকিয়ে গেছে তার।

কবর ভরাট করছে খালেদ। মায়ের কবরের কয়েক কদম সামনেই আরেকটা খোড়া কবর দেখতে পেল আহমাদ। কিছুক্ষণ পরই কিছু লোক একটা লাশ নিয়ে এল। দলটার সাথে একটা বাচ্চাও দেখতে পেল সে। হ্যা চিনতে পেরেছে। তার মা যার বাসায় কাজ করে তার ছেলেই তো এটা। ছোট বাচ্চা। বুঝে উঠতে পারছে না ঘটনাপ্রবাহ। পেছনদিকের লোকগুলো কী যেন বলাবলি করছে। একজনের গলার আওয়াজ কানে এল আহমাদের।

সাথে একটা বাচ্চাও দেখতে পেল সে। হ্যা চিনতে পেরেছে। তার মা যার বাসায় কাজ করে তার ছেলেই তো এটা। ছোট বাচ্চা। বুঝে উঠতে পারছে না ঘটনাপ্রবাহ। পেছনদিকের লোকগুলো কী যেন বলাবলি করছে। একজনের গলার আওয়াজ কানে এল আহমাদের।

‘আহারে, মহিলাটার বয়স অনেক কম ছিল। গাড়ি এক্সিডেন্ট করে আজকে সকালেই চলে গেল। তার স্বামীটা বেঁচে গিয়েছে। হাত আঘাত পাওয়া বাদে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। ছোট বাচ্চাটার কী হবে এখন?’

আহমাদ বুঝতে পারল, ওই খাটিয়ার সাদা কাফনের ভেতরে তার মায়ের খালাম্মাই ওটা। পড়ন্ত বিকেলে লালচে আকাশের নিচে কিছুক্ষণ আগেও জীবিত থাকা দুটো দেহকে গ্রাস করছে কবরের মাটি। দুজন দুরকম পৃথিবীর বাসিন্দা। খালাম্মার ভাষায় একজন ছোটলোক, আরেকজন আলিশান ফ্ল্যাটের কর্ত্রী। কিন্তু অন্তিম ঠিকানা দুজনের একই। পোকামাকড় আর কীটের বসবাস যেই মাটির তলদেশে সেখানে। এক অনন্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল আহমাদ।

কাহিনি শেষ করে দূরে কলাগাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন জমিরউদ্দিন। মুনির আর মাসুদ যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। কিছু সময় পর মাসুদ বলল, ‘সত্যি কইরা কন তো হুজুর, ওই আহমাদ পোলাটা কি আপনে?’

মুচকি হাসেন জমিরউদ্দিন আহমাদ। যেন হাসিতেই উত্তর পেয়ে যায় মাসুদ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জমিরউদ্দিনের দিকে। জমিরউদ্দিন মাসুদের চোখের দিকে তাকালে গভীরতা খুজে পেতেন। কিন্তু লতিফের দৃষ্টির মতো খেই হারিয়ে যায় না সেই গভীরতায়। বরং তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। যেখানে আশা আর বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, সেখানে খেই হারাবে কেন কেউ।

# একটা লাশ

সাবিত হাসান

আরেকটা দিন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়
এখনো কেউ আসেনি,
আসেনি তার ভাই-বোন
এমনকি তার স্ত্রী আর আদরের সন্তানরাও
আসেনি,
যাদের জন্যে জীবনের অর্ধেকটা ছেঁড়া
জুতোতে তালি দিতে দিতেই কাটিয়ে
দিয়েছিল মানুষটা
নিশ্বাসটা থেমে যাবার সাথে সাথেই সেই
মানুষগুলোই আজ নেই!

হাসপাতালের করিডোরে অনেকটা
বেওয়ারিশের মতোই পড়ে ছিল তার লাশ,
শেষমেশ চারটা পরিচিত কাঁধও তার
কপালে জোটেনি।
অদ্ভুত কাপড় পরা অচেনা কিছু লোক
তড়িঘড়ি করে কবর খুঁড়ে অনেকটা পুঁতেই
ফেলল তাকে,
কে জানে শেষ গোসলটা সে পেয়েছিল কি
না?

কাঁচা মাটির কবরের ওপরে ঝমঝম করে
বৃষ্টি নেমেছে আজ,
এই তো কিছুক্ষণ আগেই কবর দেয়া
হয়েছে তাকে,
কাঁচা বাশের গন্ধটা পর্যন্ত কেটে উঠেনি।
এই মাত্র একটা বাজ পড়ল
আচ্ছা ছোট বেলায় বাজের শব্দ পেলেই
'বাবা!' বলে চিৎকার করে জাপটে ধরা
সন্তানগুলোর মন কি একবারও জানতে
চায়নি
আচমকা বাজের শব্দে কবরের ভেতর
বাবার ভয় লাগছে কি না?
শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, 'তোমাকে কক্ষনো
একা ছেড়ে যাব না' বলা মেয়েটার কি
একটিবারও জানতে ইচ্ছে হয়নি
এই কালবৈশাখের রাতে কবরের ভেতর
তার সব থেকে প্রিয় মানুষটার একা
লাগছে কি না?

আচ্ছা এমন কি হতে পারে না মানুষটা
এখনো জীবিত আছে মাটির নিচে?
হয়তো সে অভিনয় করছে,
হয়তো সে দেখতে চাচ্ছে কে কে সত্যিই
তাকে ভালোবাসে,
কবরের ভেতর থাকা মানুষটা হঠাৎ করে
জেগে উঠলে এত সব তেতো বাস্তবতার
হাতে হয়তোবা দ্বিতীয়বার খুন হবে সে।

# বিন্দু থেকে সিন্ধু

লেখকঃ এনামুল হোসাইন।

রাত ১০ টা পার হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। স্টেশনে বসে আছি। স্টেশন মাসজিদের সামনের এক বেঞ্চিতে। হাতে আধখোলা একটা বই। পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু মন বসছে না স্টেশনের হট্টোগোলে। ঈশার জামাআত হয়ে গিয়েছে আগেই। স্টেশন মাসজিদের ছোট্টো গেটে তালাও ঝুলে গেছে। হটাৎ এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়ল। হন্তদন্ত হয়ে তিনি আমার দিকেই ছুটে আসছেন। কিছুটা অবাক হলাম। উনাকে তো চেনা মনে হচ্ছে না। ভদ্রলোক কাছে এসে আমাকে উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করলেন 'ভাই, আপনার কাছে কি কোনো জায়নামায হবে?'

ভদ্রলোক ঈশার সালাত পড়বেন। কিন্তু জায়গা পাচ্ছেন না। মাসজিদ তো বন্ধ।
জায়নামায নিয়ে ঘুরার স্বভাব আমার নেই। ভদ্রলোককে হতাশ করতে হলো। পাশেই কিছু তাবলীগের মুরুব্বি ছিলেন। তাঁদের কাছে যেতে বললাম উনাকে। সেখানেও হতাশ হতে হলো। শেষমেশ, পাশের দোকান থেকে পুরোনো একটা কাগজের বাক্স নিয়ে সেটা ভাজ করে তার ওপরই সালাত আদায় শুরু করলেন। ট্রেন আসার অনেক দেরি ছিল। হাতে অফুরন্ত সময়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছিলাম আমি।
ভদ্রলোকের সালাত পড়া শেষ হলে উনি চলে গেলেন। আমিও কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তারপর হটাৎ খেয়াল করলাম সেখানে মানে সেই কাগজের বাক্সের জায়নামাযের ওপরে আরেকজন সালাত পড়ছেন।

মাথায় হটাৎ করেই একটা চিন্তা আসল তখন।
প্রথম ভদ্রলোক জায়নামায বানিয়ে সালাত পড়েছিলেন। তার সালাত কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে। তিনি সাওয়াব পেতে পারেন নাও পেতে পারেন। কিন্তু তার বানানো জায়নামাযে যত মানুষ সালাত পড়বে সেখান থেকে তিনি সাওয়াব পাবেন। (সালাত আদায়কারীদের সাওয়াব কমানো হবে না।) যদি এখানে ১০০ জন মানুষ সালাত পড়েন, তাহলে ১০০ জন মানুষের সালাতের সাওয়াব তিনি পাবেন।

ভালো কাজের সূচনা করা খুবই সাওয়াবের কাজ। তুমি সেই কাজটি শুরু করার সময় হয়তো ভাবতেও পারবে না, এই কাজটি একসময় কী বিশাল এক কর্মযজ্ঞে পরিণত হতে পারে।
ভালো কাজ যত ছোটই হোক অবহেলা কোরো না।

> **প্রথম ভদ্রলোক জায়নামায বানিয়ে সালাত পড়েছিলেন। তার সালাত কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে। তিনি সাওয়াব পেতে পারেন নাও পেতে পারেন। কিন্তু তার বানানো জায়নামাযে যত মানুষ সালাত পড়বে সেখান থেকে তিনি সাওয়াব পাবেন**

মুসআব ইবনু উমাইর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা চিন্তা করো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশে মদীনায় ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন উনি। উনার মাধ্যমে আউস এবং খাযরায গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। উনার হাতে ইসলাম কবুল করেন সাদ বিন মুয়ায রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো মানুষ, যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় মুসআব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাওয়াতের প্রভাবে মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। মদীনায় ইসলামের ঘাঁটি তৈরি হয়। এখান থেকেই ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

এবার একটু চিন্তা করো তো, মুসআব রদিয়াল্লাহু আনহু কী বিপুল পরিমাণ সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি যখন দাওয়াত নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন, খেজুর বাগানে বসে বসে আউস বা খাযরায গোত্রের নেতাদের ইসলামের কথা শোনাচ্ছিলেন, তখন কি ভেবেছিলেন তাঁর এই ছোট ছোট কথাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ এক বিপ্লবের সূচনা করছেন?

মানুষের উপকার করা, সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলা, দারোয়ানকে-রিকশাওয়ালাকে সালাম দেওয়া,

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় পথে থাকা কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেয়ে তা সরিয়ে ফেলল। (এ কাজ আল্লাহর এতই পছন্দনীয় হলো যে) আল্লাহ তাআলা তার এ কাজ সাদরে কবুল করে নেন। তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।'[১]
ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, সেই ব্যক্তিকে এই আমলের ওসীলায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।[২]

তোমাদের আমার নিজের একটা ঘটনা বলি। আমি এক সময় বিভিন্ন কারণে হতাশায় ভুগছিলাম। একের পর এক সমস্যা আসছিল। একটার সমাধান হলে অন্যটা আরও জটিল হয়ে উঠত। কী করব বুঝে উঠতে পারতাম না। মন খারাপ করে বসে ছিলাম। আমার রুমমেট বলল- চল, ফুটবল খেলে আসি।
ফুটবল ভালো লাগত না। তারপরেও গেলাম। এক দেড় ঘন্টা ফুটবল খেলে ক্লান্ত হয়ে যখন রুমে ফিরছিলাম, তখন রুমমেট আমার ঘাড়ে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল- এনাম, চিন্তা করিস না; আল্লাহ আছেন। আর তুই মেধাবী। বলতে গেলে আমাদের সবার চাইতে। একটা না একটা সমাধান বের হয়ে যাবে। ( এই কথাগুলো লেখব কি না তা ভেবে অস্বস্তি লাগছিল। শেষমেষ লেখেই ফেললাম। নিজেকে বড় প্রমাণ করার ইচ্ছা থেকে নয়। কেবল তোমাদের বাস্তব অবস্থাটা বোঝানোর জন্য। )
ওর কথাগুলো ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। আল্লাহই সমস্যা সমাধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে ভেঙ্গে পড়েছিলাম, কোনো কিছু করার আগ্রহ, উদ্যোম হারিয়ে ফেলেছিলাম তার অনেকটাই ফিরে এসেছিল তার ছোট ছোট এই কয়েকটা বাক্যে। সে জানতেও পারল না তার এই ছোট ছোট কয়েকটা কথা আমার জীবনে কতটা প্রভাব ফেলল।
চারিদিকে অন্যায়, যুলুম অসত্য আর অধর্মের ছড়াছড়ি। আমরা আশা হারিয়ে ফেলি। প্রতিবাদ করতে ভয় পাই। ভাবি, আমার এই মৃদু প্রতিবাদে কী-ই বা হবে। অযথা ঝামেলা বাড়ানোর দরকার নেই। অথচ আমরা কিন্তু জানি না, আমার এই সামান্য প্রতিবাদেই অনেক কিছু বদলে যেতে পারে।

কোনো ভালো কাজকে ছোট ভাববে না। [৩] যতই ছোট হোক করবে। তুমি জানো না এর শেষ কতটা মধুর হতে পারে!

*তথ্যসূত্রঃ*
*[১] বুখারি, ৬৫২; মুসলিম, ১৯১৪।*
*[২] মুসনাদু আহমাদ, ১০৪৩২।*
*[৩] মুসলিম, ২৬২৬।*

# কুয়াশার চাদরে

সিদ্দিকুর রহমান

গলা থেকে পা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে হয়তো লেখাটি পড়ছ। কারণ, আজকের সকালটাও যে গায়ে ছাইরঙা কুয়াশার চাদর জড়িয়ে রেখেছে! অথবা একরাশ শুভ্র ধোঁয়ায় নাক ডুবিয়ে চুমুক দিচ্ছ চায়ের কাপে। চা খেতে খেতেই তোমার সাথে কিছু আড্ডা দিই চলো..

ব্যবহার করবে? কোনটা সবচেয়ে ভালো?
এসব কনফিউশনের কারণ নেই। আমাদের দেশীয় প্রোডাক্টগুলোই অনেক ভালো মানের। যেকোনো একটি ব্র্যান্ড ইউজ করতে পারো। তবে কোনো নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ব্যবহার করার পর যদি সমস্যার সম্মুখীন হও বা পণ্যটি

## আতঙ্কের নাম হলো- গোসল। এ যেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

আচ্ছা, শীতের এই সময়টা তোমার কাছে কেমন লাগে বলো তো? খুব রুক্ষ-শুষ্ক-বিদঘুটে?
হ্যাঁ, কিছুটা তো তা-ই। আর সে জন্যই এই সময়টাতে কিন্তু আমাদের আরও একটু বাড়তি সর্তক থাকা উচিত।

তাহলে চলো, ঝটপট শুনে নিই শীতের এই সময়টাতে কী করব, আর কী একেবারেই করব না-

এই সময়টাতে অনেকের কাছেই একটি আতঙ্কের নাম হলো- গোসল। এ যেন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা!
তবে তোমরা যারা সচেতন তারা তো জানোই, গোসল না করাটা মোটেই ভালো কিছু নয়। এতে করে বরং শরীরে রোগজীবাণু বাসা বাঁধার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়।
তাই গোসল একেবারেই বাদ না দিয়ে কুসুম গরম পানিতে গোসল করে নিতে পারো। এতে করে শরীরের স্বাভাবিক আর্দ্রতা বজায় থাকবে আর সারাটা দিন তুমি থাকবে ফ্রেশ ফুরফুরে মেজাজে, ইনশাআল্লাহ!
একইভাবে ওযুর ক্ষেত্রেও কুসুম গরম পানি ব্যবহার করতে পারো।
গোসল বা ওযুর পরে শরীরে ময়েশ্চারাইজিং লোশন বা ক্রিম মেখে নেওয়া উচিত। এতে শরীরের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় না। অনেকে কনফিউশনে থাকে, কোন ব্র্যান্ড

তোমার ত্বকের উপযুক্ত না হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত পণ্যটি আর ব্যবহার না করে অন্য ব্র্যান্ড ব্যবহার করাই ভালো।

অনেকের ধারণা, সানস্ক্রিন লোশন কেবলমাত্র গরমের দিনের জন্য। তবে শীতের দিনেও কিন্তু রোদের তীব্রতা কম থাকে না। তাই রোদে বেরোবার সময় সম্ভব হলে সানস্ক্রিন লোশন মেখে নিতে পারো।

ঠোঁটের প্রতি বাড়তি যত্ন নাও। ঠোঁটের ওপরের ত্বক পাতলা হওয়ায় এর ওপর শীতের প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি।
অনেকের একটা অদ্ভুত অভ্যাস থাকে। একটু পরপর জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটুকু ভিজিয়ে নেয় । এতে বরং ঠোঁট ফাটার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।
কাজেই জিভের ব্যবহার না করে ‘পেট্রোলিয়াম জেলি’ ব্যবহার করো।

ওহ, ভালো কথা। শুধু শরীরের বাইরের অংশের নজর দিলেই কি কাজ শেষ?
না! সুস্থ থাকতে হলে রোজকার খাবারের মেনুতেও কিন্তু একটু নজর দিতে হবে।
মজার ব্যাপার হলো, আল্লাহ তাআলা শীতকালে প্রচুর ফলমূল-শাকসবজির নিয়ামাত দিয়ে আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ!

তাই মৌসুমি ফলমূল ও শাকসবজি পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। তোমরা কি জানো যে, মৌসুমি ফলমূলগুলো ঐ বিশেষ মৌসুমে যে রোগ বালাই হয় তার বিপরীতে অনেক বেশি কার্যকরী?

শীতকালে আমরা অনেক সময় পানি পানের কথা একেবারেই ভুলে যাই। যেহেতু এ সময় ঘাম কম হয়, সেহেতু গরমকালের তুলনায় 'সামান্য' পানি কম পান করলে অসুবিধে নেই। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে, পরিমাণটা একেবারেই যেন কম না হয়ে যায়।
কারণ তো জানোই, সুস্থ শরীরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি কতটা দরকারি।

## শরীরের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি ঈমানের যত্নটুকুও নিয়ো

আরেকটা বিষয়, আপুরা টুকটাক ত্বকের যত্ন নিলেও ভাইগুলো কেন যেন এ ব্যাপারে একটু ড্যামকেয়ার হয়। এমনটা হওয়া যাবে না, বুঝলে?
না, আমি বলছি না টেলিভিশনের চটকদার বিজ্ঞাপনে দেখানো জেন্টস ক্রীম-ফেসওয়াশ এসব ব্যবহার করতে। ওসব আসলে খুব বেশি কাজের জিনিস না। কিন্তু শীতের এই সময়ে ত্বকের একটু বাড়তি যত্ন তো নিতেই হবে।
এক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার বলে নিই। যে ভাইয়াদের দাড়ি রয়েছে তারা কিন্তু কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ পাবে! কারণ দাড়ি পুরুষের মুখের সংবেদনশীল ত্বকের জন্য একটা বাড়তি প্রোটেকশন হিসেবে কাজ করে।**[১]**
দেখলে তো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ কতটা বৈজ্ঞানিক!

এইরে.. তোমার চা তো একদম জুড়িয়ে গেল!
আজকের মতো আমি যাই। আল্লাহ চাইলে আবার কোনো একদিন আড্ডা হবে। ততদিন শরীরের যত্ন নেয়ার পাশাপাশি ঈমানের যত্নটুকুও নিয়ো। আল্লাহ হাফিয।

**[১]** Are beards unhygienic?- https://tinyurl.com/tnzxtz৭m

## বই পরিচয়

# পড়তে পারো নিচের বইগুলো

- লস্ট মডেস্টি

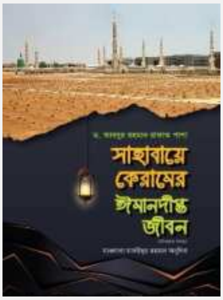


### সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত জীবনী

**লেখকঃ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা**
**রাহনুমা প্রকাশনী**

একজন শাইখ বলেছিলেন, 'আপনি দুনিয়ার সেলিব্রেটিদের সম্পর্কে যত বেশি জানবেন, তাদের তত বেশি ঘৃণা করবেন। আর আসমানের সেলিব্রেটিদের সম্পর্কে যত বেশি জানবেন, তাঁদেরকে তত বেশি ভালোবাসবেন।'

দুনিয়ায় আমাদের রোল মডেল কারা? আমরা কাদের পছন্দ করি? কাদের মতো হতে চাই? ফুটবলার, ক্রিকেটার, নায়ক, গায়ক এদের মতো, না? এদের মতোই আমরা হতে চাই। অথচ এদের ব্যক্তিগত জীবন কেমন? মাদক, পরকীয়া, উশৃংখলা, অবাধ যৌনাচার, হতাশা। এদের অনেকেই কয়দিন পরপর আইন ভেঙে জেলে যায়। অনেকেই আত্মহত্যা করে।

তুমি যখন এই দুনিয়ার সেলিব্রিটিদের রোল মডেল বানাবে, তাদের নিয়েই তুমি পড়ে থাকবে, তাদের পাগল ফ্যান হবে, তখন খুব সহজেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে তুমি। না চাইলেও তোমার মাঝে অনেক নেতিবাচক বিষয় চলে আসবে। তাই তোমাকে চিনতে হবে আসমানের সেলিব্রেটিদের।

কেন চিনতে হবে?

কারণ, তাঁরা ছিলেন এমন মানুষ, যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন। যাদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট।

তুমি কি চাও না, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন? তুমি কি চাও না, আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান? বলো তো, আল্লাহ যদি তোমার ওপর রাজি-খুশি হয়ে যান, তাহলে এরচেয়ে বড় পাওয়া, বড় সফলতা আর কী আছে?

সফলতার এই পথের সন্ধান পেতে, সেই পথে চলতে তোমাকে জানতে হবে সেসব পথিকদের জীবনী, যারা হেঁটে গেছেন আল্লাহর পথে। এবং হয়েছেন সফল। জীবনের দুঃখ, কষ্ট, জটিলতা, অস্থিরতা, না-পাওয়ার বেদনা যখন তোমার চোখে জল নামায়, তখন দরকার পড়ে কিছু সান্ত্বনার, অনুপ্রেরণার। আসমানের সেলিব্রেটিদের জীবনী তোমাকে এই সান্তনা আর অনুপ্রেরণা দেবে নিশ্চিত, ইনশাআল্লাহ।

### আয়নাঘর

**লেখক: ড. ইয়াদ আল কুনাইবী**
**ইলমহাউস পাবলিকেশন**

বালিকা থেকে তরুণীর খাতায় নাম লেখানো মেয়েটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকে আয়নার দিকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিজেকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবে - একটা ডানা থাকলে ভালো হতো, আমাকে পরী বলে ডাকতে আর কেউ দ্বিধাদ্বন্দে ভুগত না।

ঘর থেকে বের হবার আগেও তো আয়নায় সময় কাটিয়েছে নবীন কিশোর। পাড়ার মোড়ের সেলুনের আয়নাতেও আরেকবার চেক করে নেয় জেল মিশ্রিত চুলের স্পাইকটা ঠিক আছে কি না। আজকে প্রথম ডেটিং!

নববিবাহিতা যুবতি মেহেদি রাঙ্গা হাতে আয়নার সামনে বসে কাজল দেয় কাজলের চাইতেও কালো চোখে। মৃদু হাস্যে বাঁধে খোপা, নীল শাড়ির কুচি ঠিক করতে করতে ভাবে একান্ত আপন করে পাওয়া মানুষটার কথা।

১৭ বার ইন্টারভিউ ফেরত যুবক, দুপুর রোদে বহুদূর থেকে হেঁটে আসে। মানিব্যাগের জার্নাল ব্যালেন্স মিলিয়ে অর্ডার দেয় দুটো সিংগাড়া। হোটেলের বেসিনে হাত ধুতেধুতে চোখ যায় আয়নায়। ভীষণ দুঃখী এক মূর্তি তাকিয়ে আছে ওপাশ থেকে। গেল সন্ধ্যায় স্নানঘরের ভাঙ্গা আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে সাহস দিতে দিতে বহুক্ষণ কেঁদেছিল সে, আজ হয়তো আবারও...

টাইয়ের নড ঠিক করতে করতে অন্যমনস্ক সরকারি অফিসের ঘুষখোর বড়কর্তা আয়নায় দেখেন অর্ধেক চুল পেকে গেছে তার। ছেলে দুটো ড্রাগ এডিক্টেড, ছেলেদের মাকেও সেদিন দেখেছেন আফজাল সাহেবের সাথে ঘুরে বেড়াতে। আয়নায় চেয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, গভীর একটা হাহাকার উঠে হৃদয়ে, 'এত অল্পতেই বুড়িয়ে গেলাম!'

আয়না!
জীবনের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ। হয়তো আমরা খেয়াল করি অথবা করি না। কিন্তু ঠিকই আমাদের জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সাথে জড়িয়ে থাকে আয়না। আমাদের দুঃখে কেঁদে উঠে, আবার হেসে উঠে আমাদের সুখে। অনেক মানুষের মা, বন্ধু বা আপন মানুষটার চাইতেও বেশি আপন। কষ্টের প্রহরগুলোতে ঝরে যাওয়া প্রত্যেক অশ্রুফোটার নীরব সাক্ষী। জীবন পথে ক্লান্ত হয়ে আমরা আশ্রয় খুঁজি আয়নায়, খুঁজে খুঁজে বের করি জীবনের ধুলোবালি। তারপর আবার পরিপাটি করে সাজিয়ে নিই নিজেকে, আবার নামি পৃথিবীর পথে।

জান্নাত বা জাহান্নাম পর্যন্ত বিস্তৃত এই পথে চলতে গিয়ে ধুলো জমে আমাদের হৃদয়েও। চিরচেনা আয়নার প্রতিবিম্বে ধরা পড়ে না এই ধুলোবালি। পরতের পর পরত ময়লা জমে। ময়লা জমে জমে হয়ে যায় ঘা। ব্যাথায় কাতর হয়ে অস্থির হয়ে যাই আমরা। আরও অস্থির হয়ে যাই অসুখের কারণ খুঁজে না পেয়ে।

ক্রমাগত আয়না পরিবর্তন করি আমরা। একটার পর একটা করে হাতে তুলে নিই নানা 'তন্ত্র-মন্ত্রের' আয়না। লোকে কী বলবে, সামাজিকতা, সংস্কৃতি, ভোগবাদ, পুঁজিবাদ আর কুফরের ধুলো জমা থাকে সেই আয়নাগুলোর কাঁচে। হৃদয়ের ধুলো দেখা যায় না ভুল আয়নায়। ধরা পড়ে না অসুখ, আন্দাজ নির্ভর হাতুড়ে চিকিৎসায় আরও বাড়ে যন্ত্রণা। ময়লার পরত পুরু হতেই থাকে, হতেই থাকে...

রূপকথার স্নোহোয়াইটের সেই জাদুর আয়নার চাইতেও শতগুণ বেশি নির্ভুল আয়না ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে। সেই আয়নায় নিজেদের আবিষ্কার করতেন উনারা প্রতিনিয়ত। আয়নাগুলো শুধু প্রতিবিম্ব নয়, বরং দেখাত আরও কিছু বেশি। দেখাত হৃদয়ের প্রত্যেকটি খোপে খোপে লুকিয়ে থাকা ময়লার আস্তরণ। অকপট আয়না ঠিকঠাক জানিয়ে দিত - কেন মেঘ জমে হৃদয় আকাশে। সেই আয়না দেখে দেখে পরিপাটি করে সাজিয়েছিলেন নিজেদের এবং এই পৃথিবীকে। সেজেছিল মেঘ, রোদ, জ্যোৎস্না। সেজেছিল মরু, নদী, সাগর। নিপীড়িত নির্যাতিত মানবতা মুক্তি পেয়েছিল মানুষের গোলামি করা থেকে। নতুন করে ইতিহাস লিখতে বাধ্য হয়েছিল নাক উঁচু ঐতিহাসিকরা।
হারিয়ে যাওয়া তেমনি কিছু আয়না নিয়েই এই ঘর, আয়নাঘর।

# জুমুআবার দ্যা গ্রেইট ডে

তোয়াহা আকবর

**অনেক** অসাধারণ, খুব সুন্দর আর পুরস্কারে ভরা আনন্দের একটা হাদীস দিই? আমাল করবে তো?

বিশ্বাস করো, হাদীসটা পড়ে জাস্ট মাথা নষ্ট হয়ে যাবে তোমার। ইচ্ছা করবে মা-বাবা-ভাই-বোন, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সব্বাইকে জানিয়ে দিই। হাদীসটা পড়ার পরে যদি হৃদয়ে একটুও অনুভব করতে পারো, তাহলে আল্লাহর দয়া, স্নেহ, মমতা অনুভব করে আরও বেশি ভালোবেসে ফেলবে উনাকে। ইচ্ছা হবে, কীভাবে উনাকে আরও বেশি খুশি করা যায়, আরও বেশি বেশি ইবাদাত করে নিজেকে পবিত্র করা যায়, কত বেশি আখিরাতের মুদ্রা জমানো যায়, আখিরাতে ধনী হওয়া যায়।

চলো, গুণেগুণে প্রতিটা স্টেপ ফলো করে আমালগুলো করবই করব, এই দৃঢ় নিয়ত নিয়ে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে হাদীসটা মন দিয়ে পড়ি।

আউস ইবনু আউস সাকাফি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি:

**‘জুমুআর দিন যে গোসল করল, অতঃপর আগেভাগে মাসজিদে গেল; হেঁটে চলল, বাহনে চড়ল না; ইমামের নিকটবর্তী হলো; অনর্থক কর্মে লিপ্ত না হয়ে মনোযোগসহ শ্রবণ করল; তার প্রত্যেক কদমে লেখা হবে এক বছরের আমল। তথা এক বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (সারারাত তাহাজ্জুদ) সাওয়াব।’[১]**

অসাধারণ না?

স্টেপগুলো যেন মনে রাখো, লিখে নাও কিংবা নোট করতে পারো, আলাদাভাবে মনোযোগ দিয়ে হৃদয়ে গেঁথে নিতে পারো, সেজন্য আলাদা আলাদা লাইনে ভেঙ্গে লিখছি।

১. জুমুআর দিন গোসল করা।
২. আগে আগে ও পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়া
৩. ইমামের নিকটবর্তী বসা
শেষের কাতারে পিছিয়ে না পড়া অর্থাৎ
ইমামের যত নিকটে বসা যায়।

---

**[১]** সুনানু আবী দাউদ, ৩৪৫; তিরমিযি, ৫০২; নাসায়ি, ১৬৯৭; সহীহ ইবনু হিব্বান, ২৭৮১; মুসনাদু আহমাদ, ১৬১৭৩

### ৪. মনযোগসহ খুতবা শ্রবণ করা এবং বেহুদা ও অনর্থক কর্মকাণ্ড ত্যাগ করার মধ্যে এসব আদব সীমাবদ্ধ, যা খুব সহজ ও খুবই সামান্য।

জেনে রাখা উচিত যে, খুতবার সময় অহেতুক নড়াচড়া করা অনর্থক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কিংবা পরে এসে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাওয়াও অনর্থক কর্মের অন্তর্ভুক্ত।[২]

খুতবায় এত বেশি মনযোগী হতে হবে যে, কেউ কথা বললেও ইশারায় চুপ করাতে হবে, মুখে কোনো কথা বলা যাবে না। যে বলল, 'চুপ থাকো', সে অনর্থক কর্ম করল; অর্থাৎ যে তার পাশের সাথি অথবা নিজের সন্তানকে বলল, 'চুপ থাকো', সে বেহুদা কাজ করল। খুতবার সময় যে তাসবীহ অথবা মোবাইল অথবা কোনো জিনিস দ্বারা খেলল, সেও অনর্থক কর্ম করল।

একই সাথে মনে রাখি, মাসজিদে ঢোকার পর দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের সালাত আদায় করে বসলে তা অতি উত্তম একটি কাজ হবে।

সুতরাং, জুমুআর আদবসমূহে শিথিলতা করা একদমই ঠিক নয়। অন্যথায় আমরা এমন সব বিরাট সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হব, পরকালে যা আমাদের নেকির পাল্লা ভারী করবে ও অনেক অনেক বছরের সাওয়াব প্রদান করবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই শর্তগুলো পূরণ করে, তবে তার জন্য এক বছর একটানা সারারাত তাহাজ্জুদ সালাতের সাওয়াব এবং এক বছর একটানা সিয়াম পালনের সাওয়াব দেওয়া হবে (সুবহানাল্লাহ) এবং কদম যত বাড়তে থাকবে সাওয়াবও এই একই অনুপাতে বাড়তে থাকবে।
পড়লে তো! ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো তো, এরকম স্পেশাল দিন বছরে কয়টা পাবে! তাহলে, প্রস্তুতি শুরু হয়ে যাক। আর এখন থেকে জুমুআবার আসলে তোমার-আমার খুশি আর ঠেকায় কে?

এই জুমুআ থেকে তুমি-আমি একদম সবার আগে মাসজিদে গিয়ে প্রথম কাতার টার্গেট করব, ইনশাআল্লাহ। সাথে আরও আলোকিত হওয়ার জন্য সূরা কাহফের আমল (অন্তত ১০ আয়াত হলেও) আর বেশি বেশি দরুদ তো আছেই।

---

[২] সুনানু আবী দাউদ, ১১১৮; নাসায়ি, ১৭১৮; মুসনাদু আহমাদ, ১৭৬৯৭; সহীহ ইবনু হিব্বান, ২৭৯০।

ডাক্তারখানা

# ব্রণ বনাম বয়ঃসন্ধি

লস্ট মডেস্টি

আয়নার সামনে দাঁড়াতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল অয়নের। 'ধুর! আয়নাই দেখব না আর..' কিন্তু আয়না না দেখলেই যদি সমস্যা সমাধান হতো তবে তো ভালোই হতো। তা তো আর হচ্ছে না। স্কুলের মিজান, বিল্টু, মারুফ.. ওদের কে থামাবে? অয়নকে সামনে পেলেই তো টিটকারি শুরু হয়ে যায়। যেন ও একটা কৌতুকের বস্তু!

জীবনে কখনো ব্রণের সমস্যায় পড়েননি এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আদৌ আছে কি না কে জানে! অয়ন যখন আমাকে জানাল ওর সমস্যাটা, তখন ওকে বলেছিলাম একদিন সময় করে ওর সব কথার উত্তর দেব। আজ ওকে নিয়ে বসেছি। তোমরা চলে যাবে কেন? তোমরাও বসো, গোল হয়ে বসো কিন্তু সবাই।
চলো, বয়ঃসন্ধিকালের এই স্বভাবিক কিন্তু একই সাথে বিরক্তিকর ব্যাপারটাকে একটু জানার চেষ্টা করি।

আচ্ছা ভাইয়া, এটা কেন হয়?
-বয়ঃসন্ধিকাল হলো জীবনের একটা স্পেশাল সময়। শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণের এই রিহার্সেল মোমেন্টটাতে তোমার শরীর নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করে। নতুন করে নানা রকম হরমোনাল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তোমার এই দেহজমিনে।
'অ্যান্ড্রোজেন' ঠিক এমনই একটা হরমোন, যা এই সময়ে খুব বেশি বেশি ক্ষরণ হতে থাকে। এবং এই হরমোন বাবাজির কারণেই মুখ, ঘাড়, বুক বা পিঠের ত্বকে থাকা তৈলগ্রন্থিগুলো ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে উঠতে থাকে আর সেগুলো আরও বেশি বেশি তেল (সেরাম) নিঃসরণ করতে থাকে। ফলাফল- ব্রণ।
একই সাথে বলে রাখি 'জীবাণু' সংক্রমণের ফলেও কিন্তু ব্রণ হতে পারে। এবং সেটারও চিকিৎসা রয়েছে। তবে আমাদের আজকের আড্ডার বিষয় কেবল বয়ঃসন্ধিকালীন ব্রণ, ঠিক আছে?
বুঝলাম ভাইয়া। কিন্তু, বয়সন্ধিকালেও তো অনেকের ব্রণ উঠে, অনেকের আবার উঠে না। অনেকের বেশি উঠে, অনেকের কম- এর কারণটা কী?
-ঠিক বলেছ। আসলে সবার ত্বকের গঠনবৈশিষ্ট্য কিন্তু এক না। আবার হরমোনের তারতম্যের কথা বললাম যে- সেটাও সবার সমান হয় না। সেই সাথে দেখা যায় কেউ টুকটাক ত্বকের যত্ন নিচ্ছে, কেউবা আবার একেবারেই উদাসীন। পার্থক্যটা আসলে তখনই দেখা যায়।

আচ্ছা! আচ্ছা! তো এবার আসল কথা বলেন ভাইয়া, আমাদের যাদের এই সমস্যা আমরা করব টা কী?
- বলছি, শোনো...
প্রথম কথা হলো, বয়সটাকে বিবেচনা করে বিষয়টাকে সহজভাবে নাও, অহেতুক চিন্তা করবে না। কারণ- দুশ্চিন্তা, স্ট্রেস এগুলো শরীরের হরমোনাল কার্যক্রমকে আরও প্রভাবিত করে, যা পরোক্ষভাবে ব্রণ তৈরির জন্য সহায়ক।
ঘুম পর্যাপ্ত হচ্ছে তো? কোনো কারণে যদি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে (রাত জেগে পড়াশোনা বা এমনি অকারণে রাত জাগা) তো সেটা সমাধানের চেষ্টা করো। কারণ, নিদ্রাহীনতা এই সমস্যাকে আরও বাড়াবে বই কমাবে না।
প্রচুর পানি পান করো।
রোদ থেকে বাঁচার চেষ্টা করো, প্রয়োজনে ক্যাপ বা ছাতা ব্যবহার করবে।
অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষারযুক্ত সাবানের বদলে Dove জাতীয় কোমল সাবান ব্যবহার করবে। সাবানের পিএইচ সীমা ৫.৫ এর কাছাকাছি হলে বেশি ভালো হয়।
ভিটামিন-এ/সি/ই যুক্ত খাবার বিশেষ করে রঙিন ফলমূল-শাকসবজি বেশি পরিমাণে খাবে।

জিংক সমৃদ্ধ খাবারও (মাংস, ডিম, বাদাম) ত্বকের জন্য বেশ ভালো।
আক্রান্ত স্থানগুলোতে অ্যালোভেরা জেল/মধু লাগিয়ে ইনশাআল্লাহ উপকার পেতে পারো। অ্যালোভেরায় ময়েশ্চারাইজিং উপাদান রয়েছে, আর মধুতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। (যেভাবে ব্যবহার করবে: ২ টেবিল চামচ মধুর সাথে ১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা মিশিয়ে ব্রণের স্থানে লাগাও। দশ মিনিট পর কুসুম গরম পানিতে ধুয়ে নাও।)
এছাড়াও বাজারে ভালো ব্র্যান্ডের কিছু অ্যালোভেরা জেল/ক্রিম/ফেসওয়াশও রয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারো।
আরেকটা কাজের জিনিস হলো- নিম পাতা। নিম পাতা বেটে, পুরা মুখে লাগিয়ে রাখো ১০/১৫ মিনিট। সপ্তাহে ১/২ বার।
সবশেষে প্রয়োজন মনে করলে তুমি ভালো কোনো চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে পারো।

যা যা করবে না-

খোঁটাখুঁটি একদমই করবে না। এতে করে তুমি কিন্তু নিজেই ত্বকের মধ্যে আরও জীবাণু প্রবেশের রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছ!
বেশি সচেতন হয়ে বারবার মুখ ধোয়ার দরকার নেই। বরং দিনে পাঁচবার ওযু করাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত মুখ ধোয়া/বেশি বেশি ঘষা-মাজার ফলে ত্বক রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে শেষমেশ হিতে বিপরীত হয়।

বাহ! অনেক কিছু জানলাম। আচ্ছা, ডাক্তারের কথা বলছিলেন। ডাক্তার দেখাব কখন?

- বেশিরভাগের ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে ব্রণ এমনিতেই ভালো হয়ে গেলেও অনেকের জন্য ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে।
ওপরের পরামর্শগুলো যথাযথ অনুসরণের পরও অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট যেতে হবে। আরেকটা ব্যপার বলে রাখা দরকার যে, অনেকক্ষেত্রেই স্কিনের ট্রিটমেন্ট আসলে একটু সময়সাপেক্ষ এবং একই সাথে ব্যয়সাপেক্ষ তো বটেই। অনেকের তো বছর ধরে ট্রিটমেন্ট চলে। অতএব ধৈর্য ধরে বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।
আচ্ছা, ফেসওয়াশের কোনো কার্যকারিতা কি আসলে আছে? কোনটা ব্যবহার করব?

-তা তো কিছুটা আছেই ভাই। তবে ফেসওয়াশটি হতে হবে ভালো ব্র্যান্ডের এবং তোমার ত্বকের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শুষ্ক ত্বকের জন্য:
পেট্রোলিয়াম, মিনারেল অয়েল, ল্যানোলিন যুক্ত ফেসওয়াশ।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য:
অ্যালোভেরা, টি ট্রি (Tea tree) অয়েল, স্যালিসাইলিক এসিডযুক্ত ফেসওয়াশ।

যদি কোনোটা ত্বকের জন্য ইরিটেটিং মনে করো, তখন সেটা আর ব্যবহার না করাই শ্রেয়।
মূলত ব্যবহারের পর তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে- এটা তোমার ত্বকের জন্যে প্রযোজ্য কি না।
ইয়ে মানে, সবই তো ক্লিয়ার হলো, ভাইয়া। তবে, আরও একটা প্রশ্ন ছিল, কীভাবে যে বলি! আচ্ছা! মাস্টারবেশনের সাথে ব্রণের সম্পর্ক কতটুকু? যে যত বেশি মাস্টারবেট করে তার ব্রণ না কি তত বেশি হয়?

-আমি নিজে থেকেই এ ব্যপারটা বলতাম

তোমাদের। ভালো করে শোনো, চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে এ দু'য়ের মধ্যে আসলে সরাসরি কোনো সম্পর্কই নাই।
মূলত যেই সময়টাতে (বয়ঃসন্ধিকালে) স্বাভাবিকভাবেই কারও ব্রণ উঠার কথা, ঐ সময়টাতেই বেশিরভাগের হস্তমৈথুনের বদঅভ্যেস গড়ে ওঠে বলে দু'য়ে দু'য়ে চার মিলিয়ে ধরেই নেয়া হয় কারণ বোধহয় ঐটাই!
না ভাই, হস্তমৈথুনের সাথে আসলে এর কোনো সম্পর্ক নেই আসলে। পুরোটাই মিথ।

কী! খুশি হয়ে গেলে? ভাবছ- আরিব্বাহ! তবে তো এবার হস্তমৈথুনের বৈধতা চলে আসলো, না কি?
নাহ! মোটেও না। বরং ব্রণের চেয়েও আরও বড় বড় ক্ষতির কারণ এই পর্ন-মাস্টারবেশন দুষ্টজাল। ব্রণ তো ছোট্ট পুঁচকে, বাকিরা বিশালদেহী দানব। অতএব জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসো। ভেতরটাকে নোংরা রেখে পুরো ফোকাসটা কেবল বাইরের আবরণে দিলে চলবে না কি বলো?

চলো যুদ্ধে নামি। ভেতরটাকে মুছে সাফ করার যুদ্ধে
হৃদয় গহীনের আবর্জনা দূর হয়ে সেখানে গড়ে তুলি সুবাসিত ফুলের বাগান।
অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের সীমাহীন দীপ্তি আভা ছড়িয়ে পড়ুক আমাদের প্রতিটি চোখে মুখে!

ইনশাআল্লাহ!

---

> **আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন সে শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায় তখন মনে হয় কখনো কোনো কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি।** (সূরা ইউনুস, আয়াত ১২)

# হে মুসআব!

## আপনাকে আমার খুব ঈর্ষা হয়

-ওমর ইবনে সাদিক

টগবগে যুবক আপনি। মসৃণ চেহারা। চমৎকার আপনার গড়ন। রাজপুত্রের মতো বললেও কম হয়ে যায়।
দারুল আরকামে গেলেন একদিন আপনি। একটা মিষ্টি ঘ্রাণ পুরো জায়গা জুড়ে ছেয়ে গেল। সবার চোখ আটকে গেল আপনার দিকে। চেহারায় খানিকটা লজ্জা নিয়ে সালাম দিলেন সবাইকে। বসে পড়লেন একদম পেছনটায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করছিলেন। জাহান্নামের বর্ণনার সময় নিদারুণ এক ভয় স্পষ্ট হয় উপস্থিত সবার মুখে। আবার যখন জান্নাতের বর্ণনা আসে, সবাই হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। আনন্দে খেলা করে উঠে অন্তরগুলো।
একমনে শুনে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব কথা। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে। জগতের সবচেয়ে পবিত্র মানুষটার সাথে আপনি পাঠ করলেন সেই পবিত্র বাক্য। শাহাদাহ।

শান্ত যুবকের পথচলা শুরু হলো। বুকে স্বপ্ন নিয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে গেলেন আপনি। আসতে থাকল একের পর এক বাধা।

সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ মা-ই আপনার বিরুদ্ধে চলে গেল। পরিত্যাগ করল পরিবার। খুলে ফেলা হলো আপনার সেই রাজপুত্রের লিবাস। দামি প্রসাধনী, দামি খাবার-দাবার, বন্ধ করে দেয়া হলো সব।

কুরাইশের মুশরিকরা আপনার পেছনে লেগে গেল। বন্দি করে রাখল আপনাকে। এতকিছুর পরেও যখন একচুলও আপনি নড়েননি সত্য থেকে, তারা আপনাকে আরও দীর্ঘদিন বন্দি রাখল। ভেবেছিল, তাতে হয়তো আপনি থেমে যাবেন। কী বোকা ভাবনা!

একসময় মুক্তি পেলেন আপনি। যেখানে কেটেছিল আপনার শৈশব-কৈশোরের সোনালি দিনগুলো, দ্বীনের খাতিরে ত্যাগ করলেন সেটাও। বন্ধু করে নিলেন জীর্ণ পোশাক, নিদ্রাহীন রাতকে। তবুও আপনি ছিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। নিজের সব কষ্ট তখন তুচ্ছ ঠেকতো আপনার কাছে।

**আপনার নাম শুনলে হৃদয়ে একটা ঢেউ খেলে যায়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।**

হিজরত থেকে যখন ফিরে এলেন প্রথমবার, আপনাকে দেখে সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। কী থেকে কী হয়ে গেলেন আপনি...
গায়ে ভেড়ার চামড়া জড়ানো অবস্থায় আপনাকে আসতে দেখে একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের আপনাকে দেখিয়ে বললেন,
‘তাকিয়ে দ্যাখো ঐ যুবকের দিকে—যার হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা আলোকিত করে দিয়েছেন...। আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে, দ্যাখো।’

শান্ত যুবক থেকে কখন যে আপনি হয়ে উঠলেন এক পরিশ্রমী যুবক, টের পেলো না কেউ। কত মানুষকে ইসলামের ছায়ায় আনলেন। অবস্থা এক সময় এমন দাঁড়াল, ইয়াসরিবের (মদীনার) প্রত্যেকটা ঘরেই একজন না একজন মুসলিম বা মুসলিমাহ ছিল।

বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাদা পতাকা তুলে দেয়া হলো আপনার হাতে। খুব আনন্দের সাথে আপনি তা গ্রহণ করলেন। আপনার হাতে পুরোটা সময় উড়ল সেই পতাকা। আপনিও এগুচ্ছিলেন একদম বীরপুরুষ হয়ে...

উহুদের যুদ্ধ। বদরের মতোই সাদা পতাকা দেয়া হলো আপনার হাতে। হঠাৎ করে পরিস্থিতি হয়ে উঠল ভয়াবহ। মুসলিমদের ওপর আঘাত আসে তীব্রভাবে। এমনকি মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেই কঠিন সময়ে আপনি প্রিয় মানুষটার সঙ্গে ছায়ার মতো ছিলেন। পুরোটা সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে একচুলও সরেননি আপনি।

হঠাৎ এক মুশরিক ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার ওপর। তরবারির কোপে আপনার একটা হাত কেটে যায়। অন্য হাতে আপনি পতাকা উঁচিয়ে ধরলেন। খানিকপরে আসে আরেকটা আঘাত; দ্বিতীয় হাতটাও কেটে যায়। আপনার দু'বাহু দিয়ে তবুও আপনি উঁচিয়ে ধরলেন পতাকা। ক্ষান্ত হয়নি সেই নাপাক মুশরিক। একটা বর্শা বিধে যায় আপনার বুকে। লুটিয়ে পড়েন আপনি। শামিল হলেন সেরাদের দলে।

যুদ্ধ শেষ হলো। আপনাকে দাফন করার জন্য অভাব পড়ল কাফনের। একটি ছোট্ট কাফন পাওয়া গেল। কিন্তু, ছোট্ট একটি কাফনে তো পুরো শরীর ঢাকা যায় না। মাথা ঢাকলে পা হয় না, পা হলে মাথা...

অথচ কী ছিলেন আপনি!

দ্বীনের ভালোবাসায় খুলে ফেললেন রাজপুত্রের পোশাক। হারিয়ে বসলেন বিলাসিতার সকল উপকরণ। আপনার সুন্দর চেহারা মলিন হলো, কপালে ভাঁজ পড়ল। নরম হাতগুলো আজ ভীষণ খসখসে। রাজকীয় জীবনকে লাথি মেরে ফেলে আসলেন আপনি। বুকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য, দ্বীনের জন্য ভালোবাসাকে সঞ্চয় করে এগিয়ে গেলেন কত পথ। সেই পথে চলতে গিয়ে আপনি এক মুহূর্তের জন্যও অভিযোগ করেননি।

হে মুসআব, আপনাকে আমার খুব ঈর্ষা হয়! খুব! খুউউব! আপনার নাম শুনলে হৃদয়ে একটা ঢেউ খেলে যায়। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জান্নাতে আমি আপনার সাথে গল্প করতে চাই। শুনতে চাই আপনার মুখ থেকে দুনিয়ায় আপনার কাটানো সেই দিনগুলোর কথা। কাউসারের পাশে বসে শুনতে চাই আপনার তিলাওয়াত। আমাকে সেই সুযোগ দেবেন, মুসআব? রদিয়াল্লাহু আনহু।

# বন্ধুদের ‘হাস্যকর নাম’ বানিয়ে মজা করো?

আরিফ আবদুল্লাহ

তোমার বন্ধু সাইজে খাটো, তুমি তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলে - 'কীরে ট্যাপা, কই যাস?'

আবার ক্লাসের সবথেকে লম্বা বন্ধুকে দেখে দাঁত কেলিয়ে বলে উঠো - 'কীরে তালগাছ, কেমন আছিস?'

আবার তোমার কোনো তোঁতলা বন্ধুকে দেখলে এক গাল হেসে অভিনয় করে বলো- 'কীরে ক্যা ক্যা ক্যা, কী করিস!'

মোটাকে মোটু, শুকনোকে চিকনা, যাদের গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ তাদের কাইল্লা, চোখে চশমা থাকলেই কানা বলে চিৎকার করা তোমার নিত্যদিনের রুটিন, না বলতে পারলে ছটফট করে উঠে ভেতরটা! (একটাবার ভেবে নাও তো, কতটা শয়তানের ওয়াসওয়াসার বশবর্তী হয়ে আছ তুমি!)

এভাবেই তুমি তোমার বন্ধুদের একেক জনকে একেক মন্দ নামে ডাকো, যা শুনে সে রেগে উঠে কিংবা মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে ঠিকই কষ্ট পায়। কিংবা তোমার দেওয়া এই বিচিত্র নামগুলোতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মেসেঞ্জার গ্রুপেও কিন্তু নিকনেমে সবাই একেকজনকে একেকরকম নাম দেয়। ফ্রেন্ডসার্কেলকে স্লেজিং না করলে মাঝে মাঝে নিজেকে মানুষই মনে হয় না আর।

তুমি প্রত্যহ হাসি-ঠাট্টায় অহরহ মন্দ নাম বলে যাচ্ছ। তোমার কাছে এসব কোনো গুনাহ-ই মনে হচ্ছে না। কিন্তু তুমি কি জানো, ঠিক এই কারণে আল্লাহ তোমার নাম যালিমদের তালিকায় নিতে পারেন?

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অন্য কোনো নারীকে উপহাস না করে। কেননা তারা উপহাসকারিণীদের অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ কোরো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত অপরাধ। আর যারা এহেন অপরাধ থেকে তাওবা না করে তারাই প্রকৃত যালিম।'[১]

একটু ভেবে দেখো তো, এটা তোমার জন্য কত মারাত্মক রকমের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে! একদিকে আল্লাহর কাছে তুমি যালিম! আরেকদিকে গুনাহের কারণে আযাবের ভয়! সেই সাথে তোমার বন্ধু কষ্ট পেল, এবং তোমার ব্যক্তিত্ববোধটুকুও দিন দিন মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে!

বন্ধুর সাথে তো সম্পর্ক থাকা চাই মধুর। তুমি কি জানো, তোমার বন্ধু তোমার কাছে কী চায়? তোমার বন্ধু তোমার কাছে চায়:

- উত্তম ব্যবহার।
- বিপদে সাহায্য।
- আন্তরিকতা।
- ভ্রাতৃত্বের বন্ধন।

তাই, বন্ধুর সাথে দেখা হলে একে অপরকে দেখলে আগে সালাম দেবে। কখনো যদি, ঝগড়াঝাটি হয়ে যায়, তবে নিজে আগে থেকে মিটমাটের জন্য যাবে, বিপদে সাহায্য করবে। দেখবে, সেটা একদিন প্রতিদান হিসেবে ফিরে আসবে।

তাই আজই তাওবা করো। হাসি-তামাশার ছলেও বন্ধুদের আর মন্দনামে ডাকা নয়। কী দরকার সামান্য একটু বিনোদনের জন্য নিজেকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাবিত করার? আর এমন অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু আসে! ভেবে দেখো তো একবার! হাজারো ওয়াক্ত সালাত, সাওম, দান-সাদাকাহ করলে অথচ মৃত্যুর সময় যালিম হয়ে মরতে হলো! আর মন্দ নামে ডেকে তুমি তো বান্দার হক নষ্ট করলে। সেক্ষেত্রে কীভাবে ক্ষমা পেতে পারো? যদি তোমার বন্ধু ক্ষমা না করে?

[১] সুরা হুজরাত : আয়াত ১১

# আমার

# প রী ক্ষা

সুমাইয়্যা সিদ্দিকা
এমফিল গবেষক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

পরীক্ষা শব্দটা শুনলেই একটা ছড়ার কয়েক লাইন মনে পড়ে যায়। ছোটবেলায় কিশোরদের উপযোগী একটা ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম। যদিও লেখকের নাম মনে নেই আজ আর।

“জানিস না তো ছি
কালকে আমার কী?
কালকে আমার পরীক্ষা
জীবন-মরণ তিতিক্ষা।
তাই তো আমি পড়তে বসেছি।”

সত্যিই আমরা অনেকেই আছি সারা বছর চেয়ার-টেবিলের কাছে না গেলেও। যেই পরীক্ষা আসে অমনি অতি মনোযোগী হয়ে উঠি।
আবার পরীক্ষার ধরনের কথা যদি বলে, তবে সেই শিশুশ্রেণি থেকে আজ অবধি কত যে পরীক্ষা দিয়ে এলাম তার কোনো ইয়াত্তা নেই। তবে আমার মনে হয়, এখনকার বাচ্চাদের পরীক্ষার ধরন ও সংখ্যা অনেক বেশি। আজ ক্লাস টেস্ট তো কাল সারপ্রাইজ টেস্ট, পরশু হয়তো মান্থলি টেস্ট। আরও আছে সেমিস্টার এক্সাম, ফাইনাল এক্সাম, বোর্ড এক্সাম। নাম না জানা আরও কত যে এক্সাম যে দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা! পরীক্ষা দিতে দিতে অস্থির হয়ে যায়। পড়ালেখাটা একটা ভয়ের বিষয়ে পরিণত হয় অনেকের কাছে। কারণ, ভালো রেসাল্ট শুধু নয়, সবার চেয়ে ভালো করার অতিরিক্ত একটা প্রেশার থাকে সবসময়। ফলে শৈশব-কৈশোরের দুরন্তপনা পিষ্ট হয় পরীক্ষার যাঁতাকলের নিচে। আসলে কোনো কিছুই অতিরিক্তি যেমন ভালো না, তেমন কমও ভালো না।

সে যাহোক, এবার মূলকথায় ফিরে আসি। আমার মায়ের ছোটবেলার গল্প বলি তোমাদের। একেবারে প্রথম শ্রেণিতে পড়েন তখন তিনি। সুন্দর হাতের লেখায় সারা খাতা ভরে লিখে খাতাটা সুন্দর মতো ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ফলস্বরূপ ঐ পরীক্ষায় গ্রেস দিতে বাধ্য হয়েছিলেন প্রধান শিক্ষক। কী আর করা! সে তো প্রতিদিনই খাতা বাসায় নিয়ে যেত। আজ যে দিয়ে যেতে হবে তা কে জানত!

তোমরা কিন্তু ভুলেও এ কাজটি কোরো না। আম্মা হাসতেন আর পরীক্ষা এলেই তার জীবনের গল্পটা আমাদের মনে করিয়ে দিতেন।
আর আব্বা সবসময় বলতেন, পরীক্ষার হলে বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে যেন সীটের চারদিকে চেক করে বসি। বলা তো আর যায় না, যদি কেউ দুষ্টুমি করে নকলের টুকরা কাগজ ফেলে রাখে। আর নকল করে দেখে লেখা আমরা অবশ্য কল্পনাই করতে পারতাম না। আব্বা জানতে পারলে বাড়িছাড়া করবেন বলে হুমকি দিতেন।
তবে একটু আধটু শুনে লিখেছি ছোটবেলায়। একটা সময় পর ওটাও আর করতাম না। মনে হতো সবই হারাম হয়ে যাবে।

এবার বলি পরীক্ষার আগের রাতের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার আগের রাতে এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় কেটেছে প্রতিটি মুর্হূত। সারারাত জেগে পড়েছিলাম। অবশ্য পরীক্ষার হলে যে ঝিমুনি আসেনি অস্বীকার করব না। তাই বন্ধুরা সাবধান! ভুলেও এ কাজ করতে যেয়ো না। আগের রাতে নিরবচ্ছিন্ন ঘুম খুবই প্রয়োজন। তবে এজন্য তোমাকে অবশ্যই সারা বছর খাঁটা-খাটুনি করে পড়ালেখাটা এগিয়ে নিতে হবে। আমি অবশ্য একটা ট্রিক ফলো করতাম। চুপি চুপি তোমোদেরও বলি। কান লাগিয়ে শোনো। শিক্ষকদের লেকচারগুলো খুবই মনোযোগের সাথে শুনতাম। নোট নিতাম। প্রতিদিনই কিছু পড়া এগিয়ে রাখতাম। মূল বইগুলো আগেই রিডিং পড়ে রাখতাম। ফলে ক্লাসে আর নতুন

মনে হতো না। সহজ লাগত। যেখানে বুঝতাম না ওটাও মার্ক করে রাখার ফলে শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে পারতাম। তাই পরীক্ষার আগের রাতে প্রেশার কম থাকত।

আর নিজে নিজেই আগের সালের প্রশ্ন দেখে বা মডেল টেস্ট ধরে ধরে সময় ভাগ করে পরীক্ষা দিতাম। ফলে কখনোই পরীক্ষার হলে সময়ের টানাটানি হতো না। মজার ব্যাপার কী, এভাবে লেখার ফলে অনেক দ্রুত লেখার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ফলে পরীক্ষার সময় ১০/১৫ মিনিট আগেই লেখা শেষ হয়ে যেত। এরপর বেশ কয়েকবার খাতা রিভিশন করার সুযোগ পাওয়া যেত, যা বানান ভুল শুধরে নিতে অনেক বেশি সাহায্য করত।

অনেক সময় দেখা যেত, এমন সময়ে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে যখন পরীক্ষা শেষ হবে তখন আর সালাতের ওয়াক্ত থাকবে না। তো তখন কী করব? সালাত কাযা করবে? অবশ্যই না। যিনি গার্ডে থাকবেন তার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ফরযটুকু হলেও আদায় করে নেওয়া। কতজন তো ওয়াশরুমেও ছুটে। তবে বেশিরভাগেরই ধান্দা থাকে টুকরা কাগজে চোখ বুলানোর। বা নিকাবও করতে দিচ্ছে না। নিকাব খুলে ফেলব? কখনোই না। মহিলা শিক্ষকের কাছে যাচাই করতে অনুরোধ করা। তুমি যদি দৃঢ় থাকো, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবেন।

তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো আল্লাহর সাহায্য। পরীক্ষার হলে যাওয়ার পূর্বে দুই রাকাআত সালাত পড়ে সাহায্য চেয়ে নিতে ভুলো না। আর দুআ তো ভাগ্য বদলাতে সাহায্য করে। তাই না!

প্রিয় বন্ধুরা! দুনিয়ার জীবন তো মুমিনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। পরীক্ষা তো থাকবেই। তাই শুধু পড়ালেখা নয়। সবকিছুতেই হতে হবে আমাদের অনন্য। তবেই না জান্নাতি উদ্যানে ঘুরতে পারব ইচ্ছামতো। তাই আজ থেকে সময়ের কাজ সময়ে করে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেকে আরও বেশি দক্ষ করে গড়ে তুলব। এ প্রত্যয়ে হোক আমাদের নতুন দিনের শুভ সূচনা।

---

**“**

**শপথ সময়ের। মানুষ বড়ই ক্ষতির মুখে আছে।
কিন্তু তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎ কর্ম করে এবং
একে অপরকে হকের নির্দেশ দেয় ও
সবরের নির্দেশ দেয়।**

(সূরা আল আসর, আয়াত ১-৩)

# রবের উপহার

তাহরিমা জামান তুবা
রিজিয়া বেগম মহিলা কলেজ
ইন্টার প্রথম বর্ষ

বছরখানেক আগের ঘটনা! আমি তখন পুরোদস্তুর ইসলাম মেইনটেইন শুরু করেছি। রবের সাথে ভীষণ ভালো বন্ধুত্ব। হিদায়াত পাওয়ার প্রথম দিকের স্বপ্নময় সময়। সেই চমৎকার সময়ে আমার কলেজ থেকে টেস্ট পরীক্ষার নোটিশ এলো। সাথে পরীক্ষার রুটিন। প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। যুহরের ওয়াক্তের পুরো সময়টাই চলে যায় পরীক্ষার সময়ের মধ্যে। তাহলে সালাতের কী হবে! আমি কলেজে অ্যাপ্লিকেশন দিলাম। প্রিন্সিপাল স্যার ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, আমার একার জন্য এক্সাম শিডিউল বদলানো যাবে না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, গার্ড টিচাররাও কি সালাত পড়বেন না?

ক্লাসের তিন শ মুসলিম (!) স্টুডেন্টদের মাঝে হাতে ক্যান্সেলড হওয়া অ্যাপ্লিকেশন পেপার আর চোখভর্তি পানি নিয়ে আমি বজ্রাহত হয়ে বসে রইলাম। এ কোন পরীক্ষা এলো আমার জন্য!

ভীষণ মন খারাপ নিয়ে বাসায় ফিরলাম সেদিন। তারপর কুরআন খুলতেই প্রথমে চোখ পড়ল সূরা মুমিনুনের প্রথম আয়াতে। সফলতার উপায় বাতলে দিচ্ছেন এই বিশ্বজাহানের অধিপতি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা!
সেসকল মুমিন সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী!’

আমার অন্তরে প্রশান্তির হাওয়া বইল। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। দুনিয়ার লেখাপড়ার জন্য আমি দ্বীন স্যাক্রিফাইস করতে পারব না। ঠিক করলাম বাসা থেকে সালাত পড়েই হলে যাব আমি। এতে যত দেরি হবার হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর তোমার জন্য দুনিয়ার চাইতে আখিরাতই উত্তম।’[১]

অক্টোবরের ১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষা শুরু হলো। ১১ টা ৪৮ থেকে যুহরের সময় শুরু হয়। শুধু ফরজ সালাত পড়ে পরীক্ষা দিতে যাবার ব্যাপারে ইসতিখারা করেছিলাম আগের রাতে। কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ কোনো সাইন-ই পাইনি। তাই প্রথমদিন শুধু ফরজ সালাত পড়েই পরীক্ষা দিতে গেলাম। পুরো তিন ঘণ্টা সময় পাওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষা তেমন ভালো হলো না।

বিকেলে আবার ইসতিখারা করলাম ব্যাপারটা নিয়ে। আর এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখলাম। আল্লাহর কাছে তাওবা করে প্রচুর কান্নাকাটি করলাম। পরের পরীক্ষায় আর সেই পথে পা দিলাম না। সুন্নাতসহ পুরো দশ রাকাআত সালাত খুশু-খুযূর সাথে আদায় করে হলে গেলাম প্রায় ৫০ মিনিট দেরি করে। পরীক্ষা অনেক খারাপ হলো। তবুও মনের মধ্যে অদ্ভুত প্রশান্তি কাজ করছিল। বাসায় ফিরে দু’রাকাআত শুকরানা সালাত পড়লাম। পরীক্ষা এত খারাপ হবার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো কল্যাণ রয়েছে! আমার রব যা জানেন, আমি তা জানি না। আমার পুরো ভরসা আছে তাঁর প্রতি। তখনো জানতাম না আমার এই সবর এর পুরস্কার হিসেবে রবের পক্ষ থেকে আমার জন্য কী চমক অপেক্ষা করছে!
আর আমার গল্পের শুরু এখান থেকেই!

[১] সূরা আলা, ৮৭ : ৪

দিনটা ১৯ অক্টোবর ২০১৯! সেদিন হলে পৌঁছুতে আমার পাক্কা ১ ঘন্টা দেরি হলো। বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষা, অনেক লেখা। হাতে সময় মাত্র দু'ঘন্টা। তার মাঝে আধা ঘন্টা আবার অবজেক্টিভের জন্য। আমি ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা না ঘামিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে লিখতে শুরু করলাম। ওয়াল্লাহি! আমার মনে হলো, আমার হাতে কেউ চাকা সেট করে দিয়েছে, হাতের ওপরে কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, প্রশ্নপত্র দেখার সাথেই সাথেই উত্তরগুলো মুখস্থ উত্তরের মতো আমার মাথায় সাজানো হয়ে যাচ্ছিল। ফোর-জি স্পিডে আমার হাত চলছিল। ব্যাপারটা মনে পড়লে আমি এখনো চমকে উঠি। ১ ঘন্টা ২০ মিনিটে আমার সাতটা সৃজনশীলের উত্তর লেখা শেষ করে আমি যখন খাতা স্ট্যাপল করছিলাম, সবাই অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে! আমার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না।

পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরে আমি সোজা সালাতে দাঁড়ালাম। কান্নায় কণ্ঠরোধ হচ্ছিল বারবার, 'শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দিবেন যে, তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে!'[২]

পরের পরীক্ষাগুলোতেও আমার প্রায় ঘণ্টাখানেক লেট হতো। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, সেই পরীক্ষাগুলোতে বাংলা পরীক্ষার মতো মিরাকল না ঘটলেও আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিলাম, আমি সাধারণ গতিতে লিখতে থাকলেও সবার আগে আমার উত্তর লেখা শেষ হয়ে যায়। ওরা ধীরে লিখছে নাকি আমি দ্রুত লিখছি বুঝতে পারছিলাম না। একদিন আম্মুর সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করলাম। আম্মু বেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হাসলেন, 'এইটুকু বুঝতে পারলে না? তুমি সময়ের সৃষ্টিকর্তার ইবাদাতকে প্রাধান্য দিয়েছ, তাই সময়ের সৃষ্টিকর্তাও সময়কে আদেশ করেছেন তোমার জন্য বরকতময় হয়ে যেতে!

When you respect the creator of time, He makes time work in your favour!

(যখন তুমি সময়ের সৃষ্টিকর্তাকে সম্মান করবে, তখন তিনি সময়কে তোমার পক্ষে কাজ করাবেন।)'

সূর্য ডুবছে, জানালার ফাঁক গলে একফালি মিষ্টি রোদ এসে পড়ল আমার নয়নতারা গাছের ওপরে। আমি সম্মোহিতের মতো বসে রইলাম। কানে ক্রমাগত বাজছে, 'He makes the time work in your favour!'

চোখ দিয়ে অজান্তেই দু'ফোঁটা পানি গড়াল, 'হে আমার রব! আপনাকে ডেকে আমি তো কখনোই নিরাশ হইনি!'[৩]

---

[২] সূরা দুহা ৯৩ : ৫

[৩] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৪

# শব্দখেলা

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | | ৩ | | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৭ | | | ৮ | | | | |
| ৯ | | | | | ১০ | | |
| ১১ | | | | | ১২ | | |
| ১৩ | | | | | | | |
| | | | | ১৪ | | ১৫ | |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | | ২০ | | |
| | ২১ | | | | ২২ | | |

## পাশাপাশি

**১.** বিস্তীর্ণ। **৪.** সমস্ত। **৭.** ‘বক’ এর বিকৃত রূপ। **৮.** নদী মাতা যার। **৯.** *Oryza sativa* **১০.** Pressure **১১.** সূরা বাকারার ২৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ যে জিনিসটি নিশ্চিহ্ন করেন। **১২.** রক্ষাকারী। **১৩.** দ্রুত। **১৪.** জননী। **১৬.** দীনের স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে কুফরের দিকে পরিচালিত করা। **২০.** যে যুদ্ধে মুসলমানদের প্রধান প্রতিপক্ষ আবু জাহেল মারা যায় ।। **২১.** সম্মানের সাথে নম্রতা প্রকাশ করা। **২২.** চুপচাপ।

## উপর-নিচ

**১.** যা ঘটবেই। **২.** বাংলো । **৩.** দুহিতা। **৪.** সংবাদ। **৫.** কর্তৃত্ব। **৬.** তালা। **১৫.** যে মহিমান্বিত রজনীতে সর্বপ্রথম আল-কুরআন নাযিল হয়। **১৭.** Creeper এর প্রতিশব্দ। **১৮.** যারা হজ পালন করে। **২০.** হজ উমরাহ আদায়ে ওয়াজিব ছুটে যাওয়া জনিত ভুল ত্রুটি হলে তার কাফফারা স্বরূপ একটি পশু যবেহ করে গরীব মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। **২০.** প্রতিষ্ঠাতা, রচনাকারী।

**উত্তর পাঠাবে এই ঠিকানায়,**

**quiz.sholo@gmail.com**

মেইলের Subject এ অবশ্যই **“শব্দখেলা”** কথাটি লিখতে হবে। বিজয়ী তিনজন পাবে “১০০ টাকা” করে “মোবাইল রিচার্জ”।

# ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা

৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ১০০০ টাকা

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি 'ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা' সিরিজ। গল্পে গল্পে সোনামণিরা এবার জেনে যাবে সুপথপ্রাপ্ত চার খলীফার বর্ণাঢ্য জীবনী, যারা ছিলেন এই উম্মাহর সেরাদের সেরা।

# 'আমার প্রথম পাঠাগার' সিরিজ

২ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য।

৮ টি বইয়ের সেট

মূল্য: ৯০০ টাকা

এই সিরিজটি থেকে বাচ্চারা যেমন অ আ ক খ শিখবে, তেমনি শিখে যাবে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়।

আমাদের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে জয়েন করুন আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ কিতাবিয়ান-এ!

লিংক- https://www.facebook.com/groups/kitabiyan

sondiponbd
www.sondipon.com
sondiponprokashon@gmail.com
01779 19 64 19 ,01406 300 100
34, Madrasa Market (1st Floor), Banglabazar

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

# ইসলাম কেন

**বাকস্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না ?**
**মুক্তচিন্তার স্বীকৃতি দেয় না ?**
**ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় না ?**
**শুধু নারীকেই হিজাব পরতে বলে ?**

Ilmhouse

ইসলামের নিয়ে আধুনিক এসব আপত্তির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা অনেকেই বুঝি না। এই প্রশ্নগুলো শুন্য থেকে আসেনি। এগুলোর পেছনে আছে পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন পূর্বধারণা। প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে 'কঠিন' মনে হয় কারণ প্রশ্নের পেছনের ধারণাগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্রমাণিত সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ধ্যানধারণাগুলো যে সঠিক, এগুলোর যে নৈতিক বৈধতা আছে তার প্রমাণ কী? লিবারেলিসম, জাতি-রাষ্ট্রের প্যারাডাইম, বিজ্ঞানবাদ, মানবতাবাদ, নারীবাদ, প্রগতিবাদের মতো মডার্নিস্ট বিশ্বাস আর মতবাদগুলোকে আজ বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়া হয়। কিন্তু একজন মুসলিম কি এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না? এগুলোর ব্যাপারে সংশয়বাদী হতে পারে না? একজন মুসলিম সংশয়বাদীর কাজ হল মাটি খুড়ে এসব মতবাদের পেছনে থাকা ধারণাগুলোকে বের করে আনা। সেগুলোকে প্রশ্ন করা, সেগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা। এই প্রশ্নগুলো করতে শেখা এবং এসব ধারণার ব্যাপারে সংশয়বাদীতার অবস্থান গ্রহণ করা হল সন্দেহ এবং সংশয় সমাধানের প্রথম ধাপ।

সংশয়বাদী
ড্যানিয়েল হাক্কিকাতযু
অনুবাদ - আসিফ আদনান
"সংশয়বাদী" শেখাবে - আধুনিকতার মাপকাঠিতে
ইসলামকে বিচার করার বদলে আধুনিকতাকে
ইসলামের চিরন্তন মাপকাঠিতে যাচাই করতে।

www.facebook.com/IlmhouseBD

# bedouin

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর রুচিশীল মানুষ ছিলেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁর চরিত্র, আচার আচরণ, পোশাক সবকিছুর মধ্যেই আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।
নবিজী (সা.) সুগন্ধি খুব পছন্দ করতেন। তাঁর দেহ মোবারক থেকেও সব সময় সুবাস ছড়াতো। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সুগন্ধির ঝরনা বয়ে যেত। মানুষ খুব সহজেই বুঝতে পারত, নবী করিম (সা.) রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছেন।
‘চারটি বস্তু সব নবীর সুন্নত—আতর, বিয়ে, মেসওয়াক ও লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা।’
(তরজমা, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২২৪৭৮)
নবিজী (সা.) নিজে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তাঁর উম্মাহকেও সাধ্যমত সুগন্ধি ব্যবহার করতে বলেছেন।

বিভিন্ন অ্যারাবিয়ান সুগন্ধের পাশাপাশি বেদুঈনে পাওয়া যায় বিশ্বের নামকরা ব্র্যান্ডের নন এলকোহলিক রোলঅন আতর। এছাড়াও আমাদের কাছে পাবেন ক্যাসুয়াল এবং ফরমাল কোটি ও বাহারি পাঞ্জাবি।

বেদুঈনের পথচলা শুরু নবিজী (সা.)-র এই সুন্নাহ সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে। বেদুঈনের পারফিউমগুলো আপনাকে রুচিশীল মানুষ হিসেবে সমাজের দশজন লোকের ভীড়ে আলাদা করবে, সেই সাথে বাড়াবে আত্মবিশ্বাস। ইন শা আল্লাহ।

অনলাইনে অর্ডার করতে নক করুন
আমাদের ফেইসবুক পেইজ-https://www.facebook.com/bedouin.perfumes/
যেকোনো প্রয়োজনে-০১৭৪২৩০৪৬৯০
শোরুম-কর্ণফুলি গার্ডেন সিটি শান্তিনগর, কাকরাইল, ঢাকা দোকান নং ২/১৩